দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ৪ জুলাই ২০১৬।। ১৯ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।।
website : www.eswastika.com ।। শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।।

পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাতে শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণ এখন জরুরি

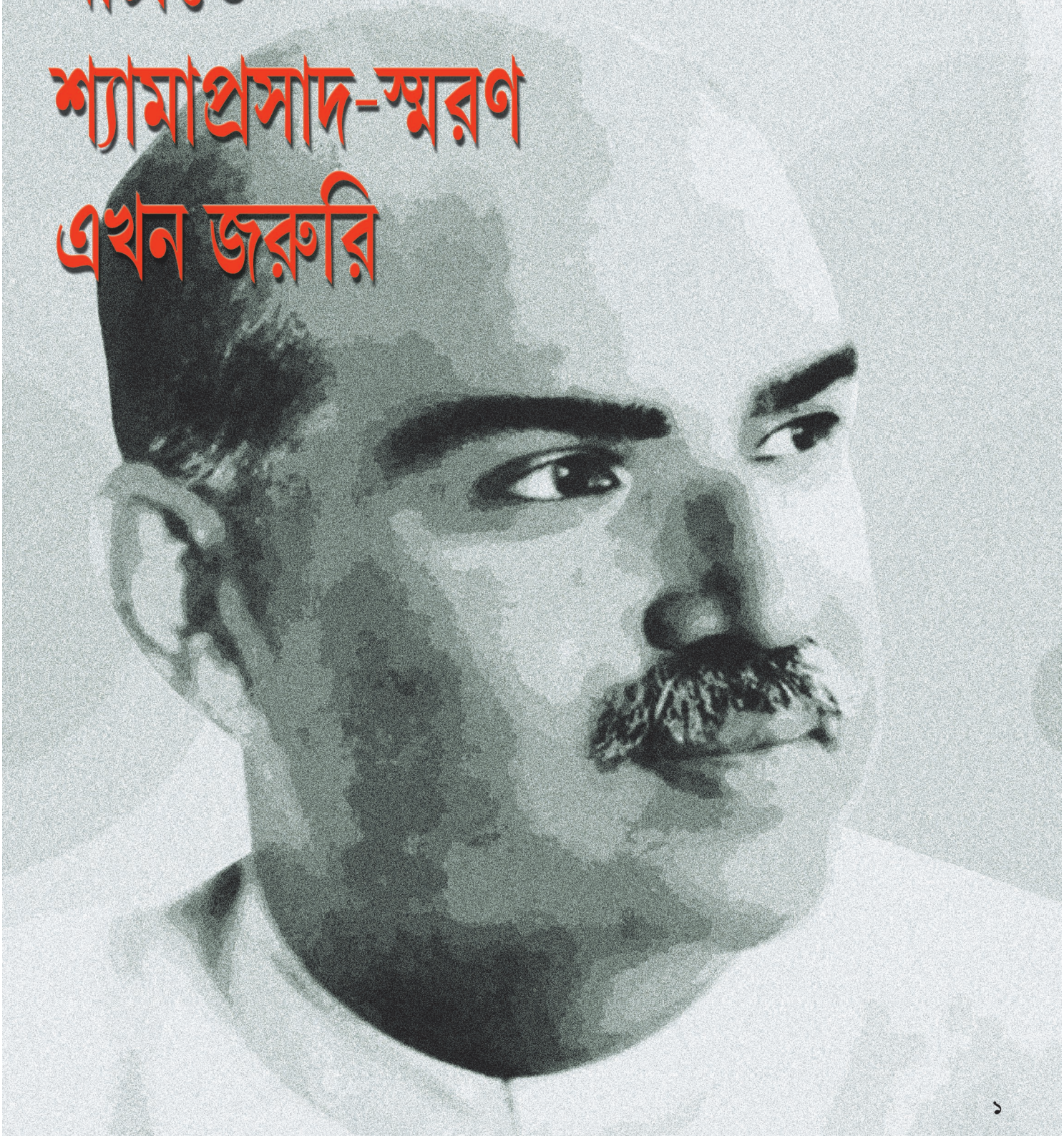

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ১৯ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৪ জুলাই - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

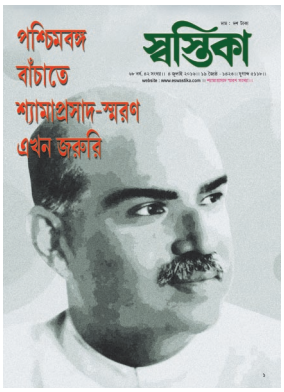

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে □ গূঢ়পুরুষ □ ৭

খোলা চিঠি : জোট কোমায়, সকলে নীরবতা পালন করুন □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষাই এখন শ্যামাপ্রসাদ স্মরণের শ্রেষ্ঠ পথ □ মোহিত রায় □ ১০

বাংলায় নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি □ প্রবাল চক্রবর্তী □ ১২

ড. শ্যামাপ্রসাদ ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা □ অমলেশ মিশ্র □ ১৫

শাশ্বত ভারত চেতনার মূর্ত প্রতীক শ্যামাপ্রসাদ ও নজরুল □ চিত্তরঞ্জন পাত্র □ ১৯

হিন্দু সমাজের দাবি : শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য উন্মোচিত হোক □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ২১

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২৪

ঐতিহাসিক দ্বিধা □ স্বাগত গাঙ্গুলী □ ২৭

ধর্মনিরপেক্ষতা সাংস্কৃতিক জাতীয়তার অঙ্গ □ আশিস রায় □ ৪১

এন এস জি ব্যর্থতায় ভারতের হতাশ হবার কিছু নেই □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৯-৩১ □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **চিঠিপত্র : ৩৫-৩৬** □ **অঙ্গনা : ৩৭** □ **সুস্বাস্থ্য : ৩৯** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২** □ **শব্দরূপ : ৪৭** □ **চিত্রকথা : ৪৮**

প্রকাশিত হবে
১১ জুলাই, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১১ জুলাই, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

হরপ্পা সভ্যতার নতুন বাঁক : বিজ্ঞানের স্পর্শে ইতিহাসের শাপমুক্তি

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সম্প্রতি হরিয়ানার রাখিবাড়ি, ভিরানা এবং তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায় হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ যেন বিজ্ঞানের স্পর্শে ইতিহাসের শাপমুক্তি। হরপ্পা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা— যার ইতিহাস প্রায় ৯ হাজার বছর আগের, বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আজ তা প্রমাণিত। এই বিষয় নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ— হরপ্পা সভ্যতার নতুন বাঁক।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কালোটাকার কথা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মাসের 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে কালোটাকা লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে স্বেচ্ছায় তাহা ঘোষণা করিবার শেষ তারিখটি (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬) স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে বিষয়টি প্রশংসাযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, দেশের ১২৫ কোটি জনসংখ্যার যে সংখ্যক মানুষ বিরাট অঙ্কের করযোগ্য আয় দেখাইয়াছেন, তাহা নগণ্য। তবুও তিনি তাহাদিগকে 'চোর' ভাবিতে রাজি নহেন। তাঁহার এই ভাবনার কথা আয়কর, কাস্টমস ও এক্সাইজ বিভাগের অফিসারদের জানাইয়াও দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কালোটাকা স্বেচ্ছায় ঘোষণা করিতে কিছুটা হইলেও তৎপর হইতে পারেন। কিন্তু ঘটনা হইল, সরকারের তরফে এই ধরনের সুবিধা আগেও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নাই। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের পরই বোঝা যাইবে মোদী সরকারের তরফে দেওয়া স্বেচ্ছায় কালো টাকা ঘোষণার সুযোগের ফলাফল কী হইল। এই কথা ঠিক, যাঁহারা এই ঘোষণায় কর্ণপাত করিবেন না তাঁহাদের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হইতে হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু দোষীদের বিরুদ্ধে তখনই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব, যখন আয়কর বিভাগ অথবা সরকারের অন্যান্য এজেন্সিগুলি কোন কোন ব্যক্তির দেশে বা বিদেশে কালো টাকা রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হয়। একবারের জন্য ইহা সম্ভব যে যাহারা কর ফাঁকি দিতে বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিয়াছেন, তাহারা ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করিয়াছেন, তাহারাও যে তাহা করিবেন এমন না হইতেও পারে। এখন পর্যন্ত সরকার এই দাবি করিতে পারে না যে, কালোটাকার সর্বপ্রকার উৎস নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন হয়তো ইহা সম্ভব যে কালোটাকার ব্যবসায়ীরা আর আগের মতো বেশি পরিমাণে অর্থ লইয়া যাইতে পারিতেছে না, কিন্তু দেশের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়া হইতেছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারকে এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যেখানে কালো টাকা সংগ্রহ করিবার সুযোগ শেষ হইয়া যায়। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, রাজনীতি কালোটাকা কাজে লাগাইবার এক বড় উপায়। গত কয়েকবছর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, ভোট প্রার্থীদের এক বড় অংশ টাকা দিয়াই ভোট কিনিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করিতে তৎপর। এই টাকা মূলত কালোটাকাই এবং নেতা ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছ হইতেই তাহা পাওয়া যায় যাহারা কালোটাকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুক্ত। তাই সরকারি নীতি-নির্ধারকরা কালোটাকা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যদি নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কারে উদ্যোগী হন তবে একটা উপায় হয়। যদি রাজনৈতিক দলগুলি কালো টাকা হইতে দূরে থাকিতে চাহেন তাহা হইলে চাঁদা হইতে প্রাপ্ত নিজেদের অর্থ সংক্রান্ত হিসাব জানাইতে অসুবিধা কোথায়? ইহা আরও বিচিত্র যে, তথ্য জানিবার অধিকার সংক্রান্ত আইনের আওতায় থাকিতেও রাজনৈতিক দলগুলি রাজি নহে। দুর্ভাগ্য হইল, এই বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলই একমত। তাই শুধু কালোটাকা নিয়ন্ত্রণ করিবার মধ্যেই সরকারকে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সর্ব প্রকারেই চেষ্টা চালাইতে হইবে। তাহা না হইলে সরকার কালোটাকা উদ্ধারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা রক্ষিত হইবে না।

সুভাষিতম্

ন অন্নোদকসমং দানং ন তিথি দ্বাদশীসমা।
ন গায়ত্রাঃ পরো মন্ত্রো ন মাতুঃ পরদৈবতম্।।

অন্ন-জলের সমান দান নেই, দ্বাদশীর সমান তিথি নেই,
গায়ত্রীর থেকে বড় মন্ত্র নেই এবং মায়ের থেকে বড় দেবতা নেই।

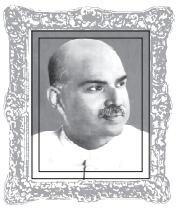

Dr.Shyama Prasad Mukherjee was a Staunch Nationalist throughout his life and his love for the Country knew no bounds.

R. C. Bhandari (HUF)

8, Camac Street,

36, Basement,

Kolkata–700017

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road

Kolkata - 700 014

(India)

Phone : +91 33 22657862, 22493855

Fax : + 91 22651063

bharatlitho@gmail.com

surendradhote@gmail.com,

www.bharatlitho.com

With Best Wishes from :

JHUNJHUNWALA JANKALYAN TRUST

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে

হ্যাঁ, রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এখন তার অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সি পি এম ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে দ্রুত চলেছে। অতীতে চীনের ভারত আক্রমণকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু-টুকরো হয়েছিল। জন্ম হয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী। তারপর আবার সি পি এম ভাঙে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। প্রমোদ দাশগুপ্ত -জ্যোতি বসুদের অগ্রাহ্য করে চারু মজুমদার -কানু সান্যালরা মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করে ঘোষণা করেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের পথই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঠিক পথ। শুরু হয়ে গেল কমিউনিস্টদের রক্তাক্ত আত্মকলহ। খুনোখুনিতে ভুগতে হলো রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সাহায্য নিয়ে প্রমোদবাবুরা সত্তরের দশকে গণহত্যা চালিয়ে মাওবাদীদের খতম করেছিল। অথচ এই প্রমোদবাবুরা তখন বিধানসভা বয়কট করেছেন সিদ্ধার্থবাবু ও তাঁর কংগ্রেস সরকার নির্বাচনে রিগিং করে ক্ষমতায় আসার প্রতিবাদে। ভারতের কমিউনিস্টরা চিরকালই দু-মুখো জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তারা বৃটিশের এজেন্ট ছিল। তাদের একমাত্র কাজ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই কমিউনিস্টরাই বলে যে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' ইংরেজ শাসক এবং মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি দেশভাগকে সমর্থন করেছিল। এই বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টদের জিন্নাসাহেব পাকিস্তানে ঢুকতে দেননি। কট্টর হিন্দু বিরোধী কমিউনিস্টরা পন্ডিত নেহরুর প্রশ্রয়ে ভারতে তাদের জনবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ অনেকটা অন্ধকার জগতের মাফিয়াদের মতো। পার্টির পরিচালনায় গোপনীয়তা যত বেশি সেই তুলনায় স্বচ্ছতা নেই। বাংলার দুর্ভাগ্য, মাফিয়া কমিউনিস্টরা এই রাজ্যে

গূঢ় পুরুষের

কলম

প্রায় সাড়ে তিন দশক ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বাংলাকে শোষণ করে আখের ছিবড়ে করে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। গত পাঁচ বছর এরা ক্ষমতায় নেই। তাতে কী হয়েছে? সি পি এমের চুনোপুঁটি নেতারা আজও রাজার হালে এই রাজ্যে বাস করে। সূর্যবাবু, শ্যামল চক্রবর্তীরা জীবনে প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি গেলে কাগজের প্রথম পাতায় খবর হয়। বিমান বসুরা ট্রেনে ভ্রমণ করেন না। ট্রেনের দুলুনিতে তাঁদের বমি পায়। সর্বহারাদের নেতাদের রাজকীয় জীবনযাত্রা দেখলে বাঙালি মাত্রেরই যে বমনের ইচ্ছা জাগে তা এবার বিধানসভার নির্বাচনে দেখা গেছে।

আবার বলছি, এই রাজ্যে বঙ্গ কমিউনিস্টদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। বঙ্গজ কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফেরার লোভে মার্কসবাদকে বরবাদ করে চরম প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের হাত ধরেছিল। খোয়াব দেখেছিল, ২০০-র বেশি আসনে জিতে তারা বাঙালির ভাগ্যবিধাতা হবে। বাস্তবে সোনিয়া গান্ধীর শাড়ির আঁচল ধরে চলতে গিয়ে বঙ্গ কমরেডরা আম ও ছালা দুই-ই হারাবে সেকথা তাদের জানা ছিল না। দলের রাজনৈতিক আদর্শ ত্যাগ করে শুধুই ক্ষমতার লালসা বঙ্গ কমিউনিস্টদের আজ জনবিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। আদর্শহীন কোনো দলই মানুষের সমর্থন পায় না। পেতে পারে না। পার্টি লাইন ভঙ্গ করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার জন্য বঙ্গ নেতাদের বড় রকম শাস্তি পেতে হয়নি। কারণ, দল ভাঙার ভয় দেখানোটাই ছিল বাংলার নেতাদের ব্ল্যাকমেলের অস্ত্র। তাই পার্টির মতাদর্শের সঙ্গে আপোস করে ছাড় দেওয়া হয় বঙ্গ কমরেডদের। ভবিষ্যতে এই আপোস করার দাম দিতে হবে সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাতদের। এতকাল কমিউনিস্ট আদর্শ মেনে সি পি এমের নীতি ছিল পার্টি লাইন ভাঙলে শাস্তি পেতেই হবে। পার্টির সিদ্ধান্তেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল জ্যোতি বসুকে। অথচ বঙ্গ কমরেডরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে দিব্যি পার পেয়ে গেলেন। বেচারা জ্যোতি বসুর জন্য দুঃখ হচ্ছে। ভারতের প্রথম বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব তিনি পাননি পার্টির নীতির জন্য। সেই নীতিটা যে কত ঠুন্‌কো তা দেখিয়ে দিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র এ্যান্ড কোং। হ্যাঁ, তাই বলছি, পার্টি বা দলের নীতি শৃঙ্খলা ভেঙে কোনো দল বেঁচে থাকে না। থাকতে পারে না। সি পি এমও থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। ▮

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

জোট কোমায়, সকলে নীরবতা পালন করুন

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

কেউ কথা বলবেন না প্লিজ। আইসিইউ-তে জোট। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু ঘোষণা হবে। সকলে নীরবতা পালন করুন প্লিজ।

এই চিঠি যখন লিখছি তখন পরস্পরের থেকে মুখ প্রায় ফিরিয়েই নিয়েছেন মান্নান-সুজনরা। সরু সুতোয় ঝুলছে পিঠোপিঠি সম্পর্ক। সুতো ছেঁড়ার 'দায়' অবশ্য নিতে চান না কেউ!

বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র দিকেই যে এগোচ্ছে সেটা ভোট মেটার পরেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু কংগ্রেস বামেদের সঙ্গ ছাড়বে না। কারণ, কংগ্রেস জোট ভাঙার 'দায়' নিতে চায় না। সিপিএম কি জোট ভাঙার 'দায়' নিতে চায়? না, ওরাও চায় না। তবে, ঠারেঠোরে তারাও বুঝিয়ে দিয়েছে যে, জোটের ভবিষ্যৎ খুব 'উজ্জ্বল' নয়।

বিমান বসুর কথাই অবশেষে সত্য হলো। বাম-কংগ্রেস জোট নিয়ে ঘোঁটই হলো। কংগ্রেস অবশ্য ঘোঁট পাকানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে ততটা ঢোকেনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারাও এখন ভিন্ন সুরে গাইছে। কিন্তু বরাবরই কংগ্রেসের বাস্তববোধ সিপিএমের চেয়ে চিরকালই কিঞ্চিৎ হলেও বেশি। ফলে, রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষিতে সিপিএমের সঙ্গে তাদের যাওয়া ঠিক হয়েছিল, না ভুল— তা নিয়ে অনর্থক কচকচিতে তারা মাতেনি। এখন যা পরিস্থিতি তাতে কংগ্রেস হয়তো সিপিএমের সঙ্গে দূরত্ব রচনা করবে। তবে ঘটা করে আলোচনাচক্র বসিয়ে লেবু কচলাবে না।

কিন্তু বামেরা বিশেষ করে সিপিএম প্রথম থেকেই জোটের যাথার্থ্য নিয়ে যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক থেকে তারা এ রাজ্যে রাতারাতি গুরুত্বহীনে পরিণত হয়েছিল! যে সংগঠনের দৌলতে একদা তাদের তীব্র রমরমা ছিল, সেই সংগঠনের অবস্থা ক্ষীণতনু। নেতৃত্বে নতুন প্রজন্মকেও তুলে আনতে পারেনি। স্বভাবতই তারা তৃণমূলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। হাত শক্ত হওয়াটা জরুরি ছিল। সেই লোভেই সিপিএম কংগ্রেসের হাত ধরেছিল।

এ পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই। রাজনৈতিক বাস্তবতাই রাজ্যে দু'টি বিরোধী দলকে এক ছাতার তলায় এনেছিল। কিন্তু 'লক্ষ্যে'র চেয়ে 'পথ' সিপিএমের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বাস্তবতা বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। এক্ষেত্রেও পলিটব্যুরোর জোটবিরোধী নেতাদের সঙ্গে রাজ্যের জোটপন্থী নেতাদের বিস্তর তর্ক-বিতর্ক ঘটেছে। এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত যা হয়েছে, তা জোটের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর নয়। একথা ঠিক, তৃণমূলের জন্মের বহু আগে থেকেই এ রাজ্যে বাম ও কংগ্রেস বিবাদমান ছিল। দু'টি দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও পন্থাও ভিন্নগোত্রের। দু'টি দলের দীর্ঘ কয়েক দশকের সংঘর্ষ-লড়াই-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই রাজ্যের ভোটারদের মধ্যে দু'টি আলাদা মানসিকতার গোষ্ঠীও তৈরি করেছে। অতীতের সমস্ত রক্তবর্ণ ভুলে গিয়ে দু'টি দলের একত্রিত হওয়া সেই প্রেক্ষিতে বেশ কঠিনই। কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে লড়তে হলে হাত শক্ত করেই লড়তে হবে—এমন একটা মনোভাব রাজ্যের একটা অংশের মানুষের মধ্যে যে দেখা যাচ্ছে, ভোটের শতাংশের হিসেবেই তার ছাপ রয়েছে। তবে সিপিএম কবে আর যথাযথভাবে জনগণের স্নায়ু বুঝতে পেরেছে! তারা নিজেদের ভালমন্দ নিয়েই বেশি ভাবিত।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে শেষমেষ যা ঠিক হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট— কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বা নির্বাচনী সমঝোতা তারা রাখতে পারছে না! রাখলে ভাল হোত কি না, তা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বস্তু। কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট। সিপিএমে মাটির সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ, কোন্দল বেশি। মানুষের থেকে দূরে সরে যাওয়াই তাদের প্রধান সমস্যা এ রাজ্যে। অন্তঃসারশূন্য নীতিচর্চায় দলের তপস্বীদের কিঞ্চিৎ শ্লাঘার বোধ হলেও হতে পারে। তবে সাধারণ মানুষের তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ, স্থবিরতা কোনো নীতির ধার ধারে না এবং সাধারণ মানুষ স্থবির নন।

আরও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, বিধানসভা ভোটের যা রায় তার পরে জোটকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা মানে স্যালাইন, অক্সিজেনের অপচয়। কারণ, গণতন্ত্রে যে বিরোধী শক্তির প্রয়োজন তার জন্য বিজেপিকে বাছার কথাই বেশি ভাববে মানুষ।

সুবিধাবাদী জোটের চেয়ে কম শক্তিমান একক শক্তি অনেক ভাল ও বড় আশ্রয়। সেই আশ্রয়ের আয়তন যতই ছোট হোক না কেন। নীড় ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড়...। গোটা দেশেই যখন কংগ্রেস বা সিপিএম ক্ষীণতনু তখন দেশের বিচারে এই রাজ্যে বিজেপির বড় হওয়ার ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত।

তাই। তাই এই চিঠি লেখার শুরুতে যে লিখেছি, অপমৃত্যুর পথে জোট তা ঠিক নয়। এটা স্বাভাবিক মৃত্যু। এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। এবং সেটাই হতে চলেছে।

— **সুন্দর মৌলিক**

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণই এখন শ্রেষ্ঠ পথ

মোহিত রায়

২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই— শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুদিন থেকে জন্মদিন— আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন কীর্তির কথা মাথায় রেখেও বলা যায় এই সময়ে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে সময়োপযোগী কাজ হবে তাঁর সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপর্যয়ের বিষয়টি প্রচার করে জনমানসকে সচেতন করা ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার প্রস্তুতি নেওয়া। শ্যামাপ্রসাদের মতন একজন কৃতী শিক্ষাবিদ রাজনীতিতে এসেছিলেন বাংলার মানুষকে ইসলামি অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি কোনো ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়ে চেয়েছিলেন বাংলার ইসলামিকরণ বন্ধ করতে। এমনকী ১৯৪৬-এর শেষ পর্যন্ত তিনি ভারত ভাগ ও বাংলা ভাগের বিপক্ষেই ছিলেন। কিন্তু যখন কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালি গণহত্যা হলো তিনি বুঝলেন যে ইসলামি অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে হিন্দুদের আলাদা বাসভূমি চাই। তাই তিনি বলেছিলেন যদি ভারত ভাগ না হয়, তবু হিন্দুর অস্তিত্বের স্বার্থে বাংলাকে ভাগ করতে হবে।

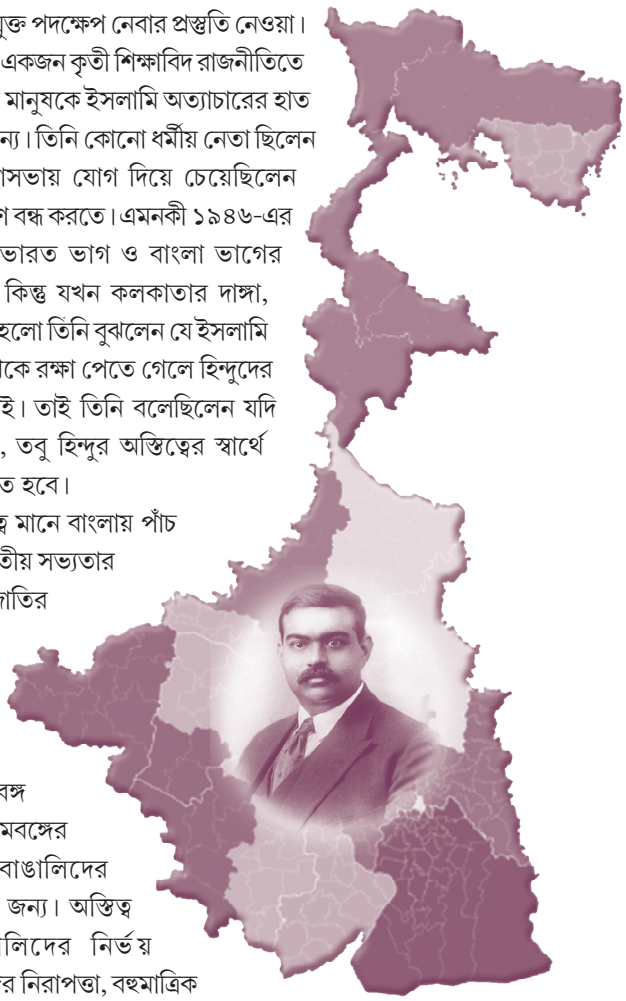

বাঙালির অস্তিত্ব মানে বাংলায় পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত একটি জাতির ধর্মীয় ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার। পশ্চিমবঙ্গ শুধু বাংলার পশ্চিম অংশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি অমুসলমান বাঙালিদের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য। অস্তিত্ব মানে হিন্দু বাঙালিদের নির্ভয় জীবনযাপন, নারীদের নিরাপত্তা, বহুমাত্রিক সংস্কৃতিক চর্চা,— এই সবকিছুই আজ বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গের আবির্ভাবের কারণ ধর্মের ভিত্তিতে বাংলার ভাগ। বাংলার এই বিভাজন হিন্দু বাঙালিই চেয়েছিল, মুসলমান বাঙালি চায়নি। কারণ অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। বাংলায় ৬০০ বছরের ইসলামি শাসনের ইতিহাস বাঙালি ভোলেনি। মাঝে ২০০ বছর অনেকটা শান্তির পর ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া কলকাতার বীভৎস দাঙ্গা, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার পর কেউ মুসলমান শাসিত বাংলায় থাকার কথা ভাবতেই পারেননি। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। দুই আইনসভাতেই অমুসলিম সদস্যরা বাংলাভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০ জুনই পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়ে গেল। হিন্দু বাঙালি তাঁর নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ স্থাপন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের দুটি প্রধান শর্ত—

(১) যথেষ্ট বেশি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও (২) একটি সুরক্ষিত বহুত্ববাদী সমাজ।

(১) যথেষ্ট বেশি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা :

১৯৫১ সালের ১৯ শতাংশ মুসলমান এখন ৩০ শতাংশের কাছাকাছি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শর্তকে ইতিমধ্যেই লঙ্ঘন করেছে। বি আর আম্বেদকর দেশভাগের অনেক আগে ১৯৪০ সালেই সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছিলেন যে, ''সংখ্যালঘু বিনিময়ই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান।' দেশভাগের সময় পাঞ্জাবের মতো বাংলায় লোক বিনিময় হলো না। ফলে ভারতীয় পাঞ্জাবে মুসলমান জনসংখ্যা কমে হলো ২ শতাংশ। তা আর খুব একটা বাড়েনি। নেহরু লিয়াকত চুক্তির ফলে (যে চুক্তির বিরোধিতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ১৯৫০ সালেই পদত্যাগ করেন) পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলেন। ১৯৭৮ থেকে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশি মুসলমানদের অনুপ্রবেশ। ব্যাপক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ও উচ্চ জন্মহারে আর দশক দুয়েকের মধ্যেই

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের আর কোনো অর্থই থাকবে না।

জনসংখ্যার এই সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ। অথচ এই বিষয়টি এখনো পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির আলোচনায় মুখ্য বিষয় হয়ে উঠলো না। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য নির্বাচনে জনসংখ্যার বিষয়টি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের ইস্তাহারে আলোচনা করেনি। অনুপ্রবেশ নিয়ে একটি দল আলোচনা করেছে কিন্তু জনসংখ্যায় এর প্রভাব ও পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সঙ্কট কখনো আলোচনায় আসেনি।

(২) একটি সুরক্ষিত গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সমাজ :

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের দ্বিতীয় আবশ্যিক শর্ত বাঙালির বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজ। ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় এসে ৩৪ বছর ধরে ইসলামি মৌলবাদকে তোষণ করলেন সিপিআইএমের নেতৃত্বে সব ধরনের বামপন্থীরা। বামপন্থী সরকার সারা রাজ্যে প্রথম মাদ্রাসা মন্ত্রীর পদ তৈরি করে একে ঢালাও মদত দিল। এসময় থেকেই শুরু হলো ব্যাপক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ। দিনে দিনে বাড়ল অসহিষ্ণুতা। সংস্কৃতির রাজধানী বলে দাবি করা কলকাতার অমেরুদণ্ডী 'সেকুলার' বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চিন্তে মেনে নিলেন ইসলামি মৌলবাদীদের দাবি— ২০০৭-এ তসলিমা নাসরিন বিতাড়িত হলেন বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গ থেকে। কলকাতার কাছেই দেগঙ্গায় বামপন্থী শাসনে তিন দিন (৭-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০) ধরে চলল হিন্দুদের বাড়ি-মন্দির-দোকানের উপর আক্রমণ। মিলিটারি নামাতে হলো সরকারকে।

এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতা পাবার লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে থেকেই শুরু করেছিলেন সাম্প্রদায়িক তোষণনীতি। ক্ষমতা পাবার পর ইসলামি মৌলবাদের তোষণ শুরু হলো পূর্ণ শক্তি দিয়ে। শুরু হলো মাদ্রাসা শিক্ষার জোয়ার, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা। কামদুনি-কাটোয়ার মতন একের পর এক সংখ্যাগুরু সমাজের মেয়েদের ধর্ষণে লিপ্ত হচ্ছে সংখ্যালঘু পুরুষেরা, বেআইনি মদ খেয়ে মৃতদের মুসলমান বলেই দেওয়া হচ্ছে সরকারি অনুদান। বাংলাদেশের মতন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চলছে শাসকের মদতে। রাজনৈতিক মঞ্চে অধিষ্ঠান করছেন পীর-ইমামরা। বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়ছে বাংলায়। দুর্গাপূজার দিনক্ষণ ঠিক হচ্ছে ইসলামি পরবের কথা মাথায় রেখে, কোথাও কোথাও দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা বন্ধ করা হচ্ছে। অমুসলমান সমাজ আজ পশ্চিমবঙ্গে নির্ভয়ে বাঁচতে পারছে না।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের বিষয়টি আমাদের সামাজিক- রাজনৈতিক আলোচনায় না এলে শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ আর থাকবে না। আগামী কয়েক দশকে তা হয়ে যাবে ইসলামি সমাজের কাছে পদানত একটি রাজ্য— যে অবস্থা মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু অংশে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে হবে। আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ ধর্মীয় কারণে বিভক্ত একটি বিশেষ রাজ্য। সেই জন্য সংবিধানের ৩৭১ ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। অসমের মতো সন্দেহভাজন ভোটারকে প্রকৃত অনুসন্ধান করে ডি-ভোটার করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করে বিতাড়নের কাজটি শুরু করতে হবে।

১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ধর্মীয় কারণে ভারতে চলে আসা হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়কে 'সংখ্যালঘু' বলে গণ্য করা যাবে না। ধর্মীয় কারণে বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গকে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এটি একটি রাজনৈতিক কাজ। ▮

With Best Compliments

From :-

A Well Wisher

Jaideep Halwasiya

বাংলায় নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি

প্রবাল চক্রবর্তী

অভিলাষদা সিঙ্গুর আন্দোলনে ছিলেন। এককালে বামফ্রন্টকে হারাতে জান লড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল বছরখানেক আগে। দেখেছিলাম, তৃণমূলের ওপর প্রচণ্ড রাগ।

অভিলাষদা : আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ওদের অহঙ্কার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলকে হারানো খুব জরুরি।

আমি : তৃণমূলকে হারিয়ে কাকে ক্ষমতায় আনবেন?

অভিলাষদা : শিলিগুড়ি মডেল। বাম-কংগ্রেস জোট হলেই তৃণমূল হারবে।

আমি : এতদিন এত কষ্ট করলেন সিপিএমকে হঠাতে, আবার তাকেই ফিরিয়ে আনবেন?

অভিলাষদা : আর কে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?

আমি : কেন, আগে তো বলতেন, বিজেপিই পারবে তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ দিতে?

অভিলাষদা : ধুর! সারদা, খাগড়াগড়— ওরা তো তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপই নিল না। রাজ্যসভায় বিল পাশ করাতে তৃণমূলের সঙ্গে ডিল করে ফেললো। তাছাড়া, অবাঙালিদের দিয়ে কি আর বাংলায় রাজনীতি হয়?

মনে মনে বলেছিলাম, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পার্টি যদি অবাঙালিরা চালায়, সে দোষটা কার? জনসঙ্ঘের প্রথমদিকের অধিকাংশ সাংসদ, বিধায়ক তো বাঙালিই ছিলেন। তখন হঠাৎ করে আপনারা সবাই কমিউনিস্ট হবার জন্য লাইন লাগালেন। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর মাথায় তুলে না নাচলে তখন তো ব্যাপারটা ফ্যাশনেবল হচ্ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পার্টির কথা মনে ছিল তখন?

কিন্তু অভিলাষদার কথাটা একদিক থেকে ঠিক। বাংলার রাজনীতিকে বাংলার কাদাজল মেখে লড়াই করে বেরিয়ে আসতে হবে। শর্টকার্টের জায়গা নেই কোথাও। যত শর্টকার্টের চেষ্টা হবে, তত আরো দেরি হবে। তৃণমূলের সঙ্গে ডিলের ব্যাপারে অভিলাষদা যেটা বলেছেন, সেটা বাংলার অনেকেরই বিশ্বাস। এটা ঠিক করা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব। নাহলে বিজেপি বাংলায় বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে না। বিশেষত যেখানে খাগড়াগড়ের সঙ্গে এই বিশাল ভূখণ্ডের সুরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। শোনা যাচ্ছে, জামাতি জেহাদিদের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম তদন্ত করতে মানা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে। আর এই নির্দেশ এসেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে। এটা দেশদ্রোহিতার সামিল। এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে তার প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হবে। তৃণমূলের সাংসদের জামাতি যোগাযোগের আজও কোনো প্রতিকার করেনি সংসদের শৃঙ্খলা কমিটি। নারদা কাণ্ডের প্রতিকার করবে তারা, এমন কোনো আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। এ সবই কিন্তু দেখছে বাংলার মানুষ।

কিন্তু বামেদের সঙ্গে হাত মেলানো এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না, রাজ্যসভায় আজ না হয় কাল বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। তখন তো ডিল খতম। সেটার জন্য অপেক্ষা করা ভালো, নাকি খাল কেটে বাম-কুমির ডেকে আনা? তৃণমূলের বিরোধিতা করতে যাঁরা জোটকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা এখন হতাশ। তাঁদের একটা কথা বোঝা উচিত ছিল, দুটো শূন্য যোগ করলে এক হয় না, শূন্যই হয়। ক্ষয়িষ্ণু দুই শক্তি— বাম আর কংগ্রেসকে একজোট করে এমন শক্তি নির্মাণ করা যায় না যা তৃণমূলকে হারাতে পারে।

উল্টোদিকে আছেন এমন অনেক মানুষ, যাঁরা তৃণমূলের ওপর হতাশ। কিন্তু যেই দেখেছেন বামেরা ক্ষমতায় ফিরতে পারে, সকাল সকাল আগেভাগে গিয়ে জোড়াফুলে ছাপ দিয়েছেন। সিন্দবাদের সেই বুড়োর মতো কমিউনিস্টদের বছরের পর বছর বাঙালির ঘাড়ে চেপে রক্ত চুষে খাওয়া, অবর্ণনীয় সেই অত্যাচারের ঘা যে এখনো দগদগে! নতুন করে আবার পার্টির দাসত্ব, আরো তিরিশ বছরের জন্য, সে ঝুঁকি নিতে রাজি হবে কে?

বাংলা আজ এক বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে। জাতীয়তাবাদী বাঙালি আজ বড্ড দিশেহারা। অনেকেই ভেবেছিল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পার্টি কালেদিনে বাঙালি আইডেন্টিটির পরিধিটা অধিকার করবে। সেটা হয়নি। তার একটা বড় কারণ, তৃণমূল ও সিপিএম— উভয়পক্ষ থেকেই একটা প্রচার নিরন্তর চালানো হয়, বিজেপি হলো অবাঙালিদের পার্টি। বিজেপি কখনই বাংলার স্বার্থ দেখবে না। দুঃখের বিষয়, অনেক সময়েই বিজেপির শুভানুধ্যায়ীরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবাঙালি পার্টির এই ভাবমূর্তিতে ইন্ধন জুগিয়ে ফেলেন। এ ভাবমূর্তি বদলাতে না পারলে বাংলায় বিজেপির শক্তিশালী হয়ে ওঠা কঠিন। নকলনবিশীতে সাফল্য আসে না।

নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটে কিন্তু বিজেপির ভাবমূর্তি আগাপাশতলা গুজরাটির। বস্তুত, যেখানেই বিজেপি সফল হয়েছে, সেই রাজ্যের আইডেন্টিটি, সেই প্রান্তের সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলোকে আঁকড়ে ধরেই সফল হয়েছে। অসম থেকে কর্ণাটক, সর্বত্রই।

আরেকটা ব্যাপার। সেই মধ্যযুগ থেকেই বাংলা বিদ্রোহী রাজ্য। 'দিল্লীর অধীনতা' শব্দটাতেই বাঙালির অ্যালার্জি। যতদিন মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেসে ছিলেন, যতদিন তাঁকে দিল্লীর কথা মেনে চলতে হোত, ততদিন বাংলার মানুষ তাঁকে ভোট দেয়নি। যদি বাংলার মানুষের মনে হয়, বঙ্গ বিজেপিকে পদে পদে দিল্লীর অনুমতির প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে, তাহলে বাঙালি কখনই বিজেপিকে আপন করে নেবে না।

হিন্দু সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন হয়েও তার রূপ অনেক। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে তার

প্রকাশ। এই বিবিধতাকে অস্বীকার করা আত্মহত্যার নামান্তর। হিন্দু সংস্কৃতিরই এক বিশিষ্ট রূপ বঙ্গ সংস্কৃতি। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বঙ্গ সংস্কৃতির—তার বিশিষ্টতার মনন খুব জরুরি। কেন? বলছি।

'জল' এবং 'পানি', দুটো শব্দই সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। 'পানি' আরবি শব্দ নয়। অথচ বাঙালি হিন্দুরা 'জল' বলে, বাঙালি মুসলমানরা বলে 'পানি'। বাঙালি হিন্দুরা পরে ধুতি, বাঙালি মুসলমানরা পরে লুঙ্গি। লুঙ্গি আরবি পোশাক নয়, বর্মী পোশাক। কখনো ভেবে দেখেছেন, এমনটা কেন হয়? এই আপাত-সাধারণ ব্যাপারগুলোর মধ্যেই আমার উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে।

ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে হিন্দু সংস্কৃতি যে বিশেষ রূপ নিয়েছে, তা হলো বঙ্গ সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি ভারতবর্ষকে গুপ্ত ও পাল— দুই শক্তিশালী সাম্রাজ্য উপহার দিয়েছে। বারংবার বিদ্রোহে মুঘল সাম্রাজ্যকে নাস্তানাবুদ করেছে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের বোধন করেছে। অখণ্ড ভারতকে মাতৃরূপে আরাধনা করতে শিখিয়েছে। চৈতন্য, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের মতো তেজঃপুঞ্জের জন্ম দিয়েছে। আজও অপার শক্তি সঞ্চিত রয়েছে এই বঙ্গ সংস্কৃতির গর্ভে। তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার লোক চাই।

ওয়াহাবিরা যখন প্রথম বাংলায় এসেছিল, বাঙালি মুসলমানদের তখন ওরা হিন্দুদের থেকে আলাদা করতে পারতো না। ভাষায়, পোশাকে, নামকরণে, হাবেভাবে তারা এতটাই বাঙালি ছিল, তাদের আলাদা করে চেনা যেত না। ওয়াহাবিরা তখন থেকেই বাঙালি মুসলমানদের ওপর অবাঙালি পোশাক, অবাঙালি আরবি-ফার্সি নাম, ভাষার মধ্যে উর্দু-ঘেঁষা শব্দগুচ্ছ চাপিয়ে দেওয়া শুরু করল। আর তখন থেকেই বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙালি আইডেন্টিটি জেহাদিদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওরা জানে, একবার যদি বাঙালি পরিচয়কে মুছে ফেলা যায়, বিরাট এই জনগোষ্ঠীকে আরবি সংস্কৃতির দাস বানাতে সময় লাগবে না। উল্টোদিকে, যদি বাঙালি আইডেন্টিটি বেঁচে থাকে, যদি ক্রমশ শক্তিশালী হয়, তবে আজ না হয় কাল বাংলাদেশও তার হিন্দু স্বরূপ উপলব্ধি করবে। জেহাদিদের অস্তিত্ব মুছে যাবে গোটা পূর্ব ভারত থেকে। তাই বাংলায় দেশপ্রেমী হিন্দুত্ববাদী শক্তির প্রধান হাতিয়ার— বাঙালি আইডেন্টিটি। প্রধান চ্যালেঞ্জ— বাঙালি আইডেন্টিটির পুনর্জাগরণ।

দেশভাগে গোটা পঞ্জাব আর বাংলা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সেটা আটকেছিলেন। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্বপঞ্জাব আর পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে এনে বলেছিলেন, 'জিন্না ডিভাইডেড ইন্ডিয়া, আই ডিভাইডেড পাকিস্তান'। সেদিন থেকেই জামাতিদের পয়লা নম্বরের শত্রু পশ্চিমবঙ্গ। শোনা যাচ্ছে, মওদুদীর শিষ্যরা পাকিস্তান ভাগের প্রতিশোধ নেবে এবার, পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করে।

শেখ হাসিনার তাড়া খেয়ে বাংলাদেশের জেহাদিরা আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সীমান্ত জেলাগুলো দ্রুত তাদের দখলে চলে যাচ্ছে। কমিউনিস্টরা তিন দশক ধরে অনুপ্রবেশকারীদের অবাধে ঢুকতে দিয়েছিল। পালিয়ে আসা জেহাদিরা সহজেই সেই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে জনভিত্তি তৈরি করে ফেলেছে। ওই জেলাগুলোতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। হিন্দু মেয়েরা অপহৃতা, ধর্ষিতা হচ্ছেন প্রতিদিন। হিন্দুরা জমি বিক্রি করে পালাচ্ছে। গাঁজা, আফিম, জালনোট থেকে শুরু করে মেয়ে পাচার, আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা— অবাধ ব্যবসা চলছে। দেগঙ্গা-কালিয়াচকে তো শুধু জল মাপা হয়েছিল। আগামী ক'বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জুড়ে 'পশ্চিম বাংলাদেশ'-এর দাবিতে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' শুরু হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বাংলার রাজনীতির দুই সেকুলার ঘোড়া সেসব বেমালুম ধামাচাপা দেবে, তিরিশ পার্সেন্ট ভোটের লোভে।

তিরিশ পার্সেন্ট ভোটের সত্যিই কতটা ক্ষমতা? মুসলমান ভোট না পেয়েও মালদহ থেকে স্বাধীন সরকার জিতলেন কী করে? কী করে মুসলমান ভোট বিরুদ্ধে যাওয়া সত্ত্বেও অসমে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল? ভারতের 'যে দুটো' রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা সর্বাধিক, সেই জম্মু-কাশ্মীর ও অসমে বিজেপির সরকার। এই অঘটন দুটো সম্ভাবনার কথা বলছে। প্রথমটা হলো, মুসলমান ভোট বলে কোনোকালেই কিছু ছিল না। মুসলমানরা অন্যান্য ভারতীয়দের মতোই নিজেদের ইচ্ছেয় যাকে খুশি ভোট দেয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা হলো, মুসলমান ভোটের বিপরীতে হিন্দু ভোটের আবির্ভাব হয়েছে। যেখানে হিন্দুরা মনে করছে, মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্লক ভোটিং করতে পারে, সেখানে হিন্দুরা একজোট হয়ে বিপরীতে ব্লক ভোটিং করে মুসলমান ভোটকে হারিয়ে দিচ্ছে।

আজ যা অসমে হলো, কাল তা বাংলায়ও হতে পারে। অসমে যেভাবে মা কামাখ্যা, ব্রহ্মপুত্র নদ ও শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে আঁকড়ে ধরে অসমিয়া আইডেন্টিটির জাগরণ হলো, সে জাগরণ যেভাবে অধর্মের পক্ষকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল, বাংলায় তা হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। দরকার যোগ্য নেতৃত্বের। এমন নেতৃত্ব, যা বাঙালি আইডেন্টিটির জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। যাকে বাঙালি ভরসা করতে পারবে। যে নেতৃত্ব বাংলার স্বার্থ দেখবে, বাংলার জন্যই লড়াই করবে। যাকে দেখে সাধারণ বাঙালি সমাজ বলবে, এ তো আমাদেরই একজন। আমার আশা ভরসা সব শুকিয়ে গিয়ে ঠেকেছে একটা মানুষেরই ওপর। সে মানুষটা ছাত্রজীবনে দেশের জন্য ঘর ছেড়েছিলেন। সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটিয়েছেন। গ্রাম থেকে উঠে আসা লড়াকু নেতা, দক্ষ সংগঠক। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যদের অধিকাংশই ছিলেন ঘোষ। বাংলার ঘোষরা ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দিলীপ ঘোষ কি পারবেন, বাংলায় আরেকটা নবজাগরণ আনতে? বাঙালি আইডেন্টিটির পরিধি অধিকার করতে? পারবেন কি, বাংলায় নতুন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে?

বাংলায় মূলতঃ দু'ধরনের রাজনৈতিক

সংস্কৃতি প্রচলিত। কংগ্রেসি সংস্কৃতি আর কমিউনিস্ট সংস্কৃতি। কংগ্রেসি সংস্কৃতি আদতে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি। 'কিং ইজ অলওয়েজ রাইট', এটাই মূলমন্ত্র। সামন্তপ্রভুরা তাদের অধীনের সবাইকে নিজের সম্পত্তি মনে করে। সেই মানসিকতাই দেখা যায় এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। সামন্ততন্ত্রের মতোই সে মালিকানা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। নেতৃত্ব সবসময় বিশেষ কয়েকটি পরিবার এবং পারিবারিক সম্পর্ক বা জানাশোনা থেকেই আসে। সাধারণ পরিবারের কর্মীরা শত যোগ্যতা থাকলেও তাদের ভূমিকা সবসময়েই পদাতিক যোদ্ধার। সংগঠন বলতে বোঝায় স্থানীয় নেতা, আর সেই নেতাকে ঘিরে থাকা কিছু স্তাবক তথা কর্মী। সংগঠনের শক্তি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় নেতা-নির্ভর। নেতাদের কাছে কর্মীদের প্রাণ বা মানসম্মানের কোনো মূল্য নেই। কর্মীরা এখানে 'এক্সপেন্ডেবল', দরকার হলেই তাদের বলি দেওয়া যায়।

এর বিপরীতে আছে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি, যা মূলত ইউরোপীয় একনায়ক -তন্ত্রের সংস্কৃতি। তাদের মূলমন্ত্র, 'অল আর ইকুয়াল, বাট সাম আর মোর দ্যান ইকুয়াল'। এরকম সংগঠনের মাথায় থাকে একজন (বা একদল) একনায়ক। নিচে থাকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং মগজধোলাইপ্রাপ্ত অনেক কর্মী। নেতারা যেভাবে আদর্শের ব্যাখ্যা করে, কর্মীরা সেটাকেই মেনে নেয়। সংগঠনের শক্তি স্থানীয় নেতা-নির্ভর নয়। সংগঠনের মাথারা যখন মনে করে, যেকোনো স্থানীয় নেতাকে সরিয়ে অন্য কাউকে বসাতে পারে। সংগঠনের স্বার্থে, হয়ত বা নিজের স্বার্থেও। কর্মীদের প্রাণ এখানে সংগঠনের সম্পত্তি। এখানেও কর্মীরা 'এক্সপেন্ডেবল', চাইলেই তাদের বলি দেওয়া যায়।

পার্টি যেটাই হোক, স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন বাংলার মানুষ মূলত এই দু'ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই দেখে এসেছে। হালে সবাইকে চমকে দিয়ে তৃতীয় এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছে। সঙ্ঘের সংস্কৃতি, যা ভারতীয় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের সংস্কৃতির উত্তরসূরি। যেখানে সংগঠনের চালিকাশক্তি সদস্যদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ। শক্তির উৎস স্থানীয় কর্মীদের আদর্শনিষ্ঠা। পুরো পার্টিটাই যেন একটা যৌথ পরিবার। কেউ রাজা নয়, কেউ প্রজা নয়। নেতা-কর্মীর ভেদ নেই, কর্মীদের মধ্যে থেকেই প্রয়োজনে নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে। কেউ 'এক্সপেন্ডেবল' নয়। ভূমি-উদ্‌গত আদর্শে বলীয়ান এই সংস্কৃতির মূলমন্ত্র, 'অল ফর ওয়ান, ওয়ান ফর অল'। একজন কর্মীর গায়ে হাত পড়লে গোটা সংগঠন প্রতি-আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সদা-হাস্যমুখ দিলীপদার রুদ্ররূপ দেখে চমকে উঠেছে অনেকেই। প্রত্যাশিতভাবেই ভয় পেয়েছে তারা, যাদের মন দুর্বল, যাদের হারানোর আছে অনেক কিছু। বাজারি পত্রপত্রিকাগুলো মেতে উঠেছে নিন্দায়। আর সাধারণ ঘরের বাঙালিরা? অনেকদিন পরে কেউ তাদের হৃদয়তন্ত্রী ছুঁয়েছে। বাঙালি তো চিরকাল এটাই চেয়েছে। আপোশহীন নেতা, বিপ্লবী যোদ্ধা। যে নেতা শত্রুর সঙ্গে ডিল করবে না। অন্যায় সহ্য করবে না। সহিংস অত্যাচারীর সামনে অহিংসার বুলি আওড়াবে না। সঙ্গীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে না। বাঙালি তার নেতার মধ্যে চিরকালই মাস্টারদা আর বাঘা যতীনকে খোঁজে। এর কমে বাঙালির মন ভরে না।

ওয়াহাবি জামাতি জেহাদিদের করাল দংষ্ট্রা প্রসারিত হচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ। অস্তিত্ব বিলোপের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গ-সংস্কৃতি। অধিকাংশ বাঙালির তবু হুঁশ নেই। আশার কথা একটাই, বাঙালির পক্ষে লড়ার একটা লোক পাওয়া গেছে আজ। অনেকদিন পরে। তেষট্টি বছর পরে।

(লেখক প্রবাসী ভারতীয়)

ড. শ্যামাপ্রসাদ ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা

অমলেশ মিশ্র

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একজন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, সমাজ সংস্কারক এবং একজন মানবপ্রেমী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যে-কোনো একটি দিক নিয়েই সমৃদ্ধ নিবন্ধ রচনা করা যায়।

শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব ১৯০১ সালের ৬ জুলাই এবং তিরোভাব ২৩ জুন ১৯৫৩। পিতা--- বিদ্যার সারথি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাতা যোগমায়া দেবী। রাজনৈতিক জীবন মাত্র ১৪ বছরের ১৯৩৯-১৯৫৩। এত অল্প বয়সে এত বৈদগ্ধ লক্ষ্য করা গেছে খুব কম মানুষের মধ্যেই।

বিংশ শতাব্দীতে যে দু'জন বিশিষ্ট বাঙালি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার গভীর ও অনপনেয় কৃতিত্বে ভারতের রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন, তাঁরা হলেন— সুভাষচন্দ্র বোস ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। সেমেটিক প্রভাবে প্রভাবিত ভারতের তৎকালীন নেতৃত্ব এবং স্বাধীনোত্তরকালে কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদের দূরদৃষ্টির অংশমাত্রও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ৭০ বছর পরেও এই দেশ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারেনি।

ড. শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যটির প্রকৃত স্থপতি ও রক্ষাকর্তা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে পুরো বঙ্গ প্রদেশকে ভারতরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলা নামে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। ইংরাজ ও মুসলিম লীগের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর দুর্বার আন্দোলনের ফলেই বঙ্গ প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অংশগুলি নিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুরা যে ভারতবাসী হিসাবে পরিচয় দিতে পারছে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত, অত্যাচারিত হিন্দুরা যে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় পেয়েছে— সে কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদেরই।

শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে পরিচিত হয়ে সারা ভারতে এবং অনেকগুলি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গ শ্যামাপ্রসাদকে মর্যাদা দেয়নি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর একটি কথার উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন--- 'আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি'।

শ্যামাপ্রসাদের সমগ্র রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে— প্রয়োজনে হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও, তিনি কখনও হিন্দুত্বের প্রবক্তা হতে চাননি। তাঁর কোনো তথাকথিত হিন্দু-গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মানুষ। মনুষ্যত্বকে স্থান দিয়েছিলেন রাজনীতির অনেক উপরে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আবার মুসলমানদের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে তিনি সমান তৎপরতা দেখিয়েছেন। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল মুসলমান।

১৯৪১ সালে ফজলুল হক বাংলার মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদকে নিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠরা বিশেষ করে আবুল মনসুর আহমদ (পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন) শ্যামাপ্রসাদকে মন্ত্রী করার তীব্র বিরোধিতা করেন। তার জবাবে ফজলুল হক বলেন, "শুন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদেরে চিনো না, আমি চিনি। সে স্যার আশুতোষের বেটা। করুক সে হিন্দুসভা। হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তার মতো উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজন পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি সব দিক ভাইবা চিন্তাই তারে নিতেছি। আমারে যদি বিশ্বাস কর তারেও বিশ্বাস করতে হবে।"

মনসুর সাহেবের শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে ভুল এমনই ভাঙল যে তিনি বললেন, 'হিন্দুসভার নেতা হইয়াও কোনো হিন্দু

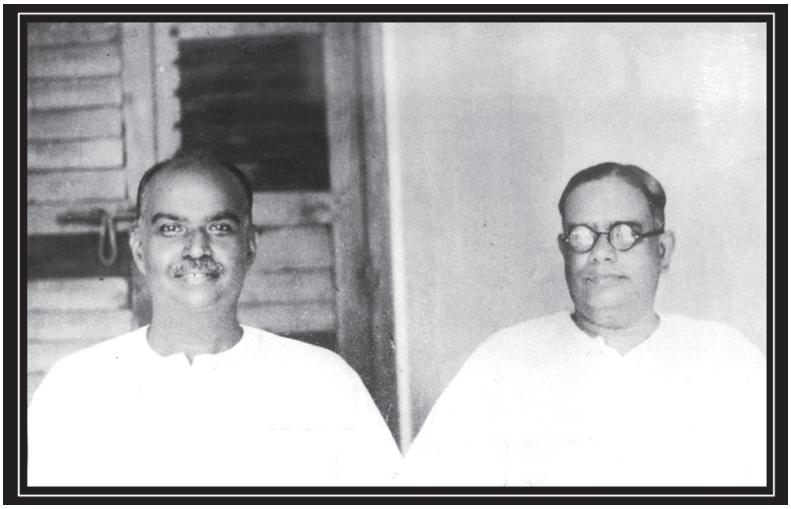

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী (পুরী, ১৯৪৬)

নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এত উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল শ্যামাপ্রসাদকে দেইখ্যা।'

বাংলার একজন প্রাদেশিক নেতা হিসেবে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু বেরিয়ে এলেন একজন রাষ্ট্রীয় নেতা রূপে। সমস্ত অকংগ্রেসী জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে তাদের নেতা তথা মুখপাত্র রূপে দেখতে শুরু করলেন।

সেই সময় সংসদের (তখনকার সংসদই ছিল সংবিধান পরিষদ— Constituent Assembly এবং ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল) ভিতরে বা বাইরে কোনো সংগঠিত জাতীয়তাবাদী বিরোধীদল ছিল না। কমিউনিস্টরা রাশিয়ার দালালি করত এবং জাতীয়তাবাদী ভূমিকাও ছিল না। শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ ও আচার্য নরেন্দ্র দেব যে সমাজতন্ত্রী দল চালাচ্ছিলেন, সেটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় নেহরুর মতোই ছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয়তার ধারণা অতিশয় প্রাচীন। স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ধারণার থেকে অনেক উদার ও মহান। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের ধারণা— রাজনীতিভিত্তিক। তার মধ্যে দ্বেষ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, হানাহানি আছে। অপরদিকে ভারতের জাতীয়তা সংস্কৃতি ভিত্তিক। এবং তার ফলে সমন্বয়ই এই জাতীয়তার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের জাতীয়তা— সাংস্কৃতিক জাতীয়তা তা নির্জলা রাজনৈতিক নয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে জাতীয়তার ধারণা এক উচ্চমানের, উদারতার ও মানবিকতার। এই জাতীয়তা এত দৃঢ় ও অটুট ছিল যে, ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে গ্রিক, শক, হুন, পাঠান, মোগল ও খৃষ্টানরা দীর্ঘ ২২০০ বছর ধরে এই দেশকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করেও তার জাতীয়তার পরিবর্তন করতে পারেনি। পৃথিবীর অন্যান্য কোনো দেশই বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল লড়াই করে টিকে থাকতে পারেনি। ভারতবর্ষের এই অনন্যতা ও অনম্যতা কেবলমাত্র এর সাংস্কৃতিক জাতীয়তার কারণেই।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি।।

অথবা

হিমালয়ং সমারম্ভ যাবদিন্দু সরোবরম্।

হিন্দুস্থানমিতি খ্যাতম্ আদ্যন্তক্ষর যোগতঃ।।

অথবা

হিমালয়ং সমারম্ভ যাবদিন্দু সরোবরম্।

তং দেবনির্মিত দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে।।

এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তা--- হিন্দু জাতীয়তা। একে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে---সপ্তগিরি, একাদশ নদ-নদী, সপ্তদশ তীর্থক্ষেত্র, একান্নটি পীঠ, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, পঞ্চ সরোবর, চার কুম্ভ, দ্বাদশ গণপতিস্থান এবং সপ্ত পর্বত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করলেন যে হিন্দু মহাসভাকে যদি কংগ্রেসের বিরোধীর ভূমিকায় দাঁড়াতে হয়, তাহলে 'হিন্দু' শব্দটিকে 'ভারতীয়' শব্দেরই সমার্থক বলে গ্রহণ করতে হবে, যেটি 'সিন্ধু' শব্দেরই অপভ্রংশ--- যাকে গ্রিকরা 'ইন্ডাস' বলে উচ্চারণ করত। বৃটিশদের প্রচারে ও কংগ্রেসি মূর্খতার ফলে যে মানুষরা নিজেদেরই জাতীয় নাম ও আদর্শগুলিকে ঘৃণা করে বিচ্ছিন্নতাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, দেশের সেই সমস্ত শক্তিগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দুত্ব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মুসলিম সমস্যার চিরদিনের মতো সমাধান সম্ভব, যদি দেশের সমস্যাগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে হিন্দুত্ব তথা জাতীয়তাবোধের ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে তোলা যায়। কংগ্রেস এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে হিন্দুর সহায়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে অথচ হিন্দু স্বার্থরক্ষা করার কথা চিন্তা করা বা বলা পাপ বলে মনে করে। সেই প্রতিষ্ঠান কী করে লড়তে পারে আর এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে মুসলিম প্রাধান্য স্থাপন করাই, ইসলামের ধ্বজাকে বাড়িয়ে তোলাই তার একমাত্র কাম্য মনে করে? ভারতের সব হিন্দু এক— যতদিন না এই বোধ আমাদের দৃঢ় ভাবে জন্মাবে, ততদিন হিন্দুরাষ্ট্র বা তার জাতিগত প্রাধান্য এদেশে স্থাপিত হতে পারবে না।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী একটি অরাজনৈতিক সংগঠন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবরাও হেডগেওয়ারের সঙ্গে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি শ্যামাপ্রসাদের পরিচয় হয় কলকাতায়। পরবর্তীকালে শ্রী গোলওয়ালকরজীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল।

হিন্দুরাষ্ট্র সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের ধারণা খুবই সরল ও প্রাঞ্জল ছিল। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে হিন্দুরাষ্ট্র একটি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন, অভিজাত তথা মহান অর্থবোধক ধারণা। এই শব্দটি ভারতের বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের সমস্ত অনুরাগীদের অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্য তথা মহান অর্থবোধক ধারণা। এই জন্য হিন্দুরাষ্ট্র কখনই একটি সাম্প্রদায়িক অথবা সঙ্কীর্ণ ধারণা নয়।

এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি বললেন— ''জাতপাত তথা উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিকাশে উৎসাহ দান বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হবে কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে ভারতমাতার প্রতি প্রকৃত অনুগত সর্বশ্রেণীর মানুষকে এই আশ্বাস দিতে হবে যে তাদের সম্পূর্ণভাবে আইনের সংরক্ষণ দেওয়া হবে এবং সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারেই পুরোপুরি সমান আচরণ তাদের সঙ্গে করা হবে।''

অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দানে তাঁর ঘোষণা ছিল— সাংস্কৃতিক জাতীয়তার রাজনৈতিক রূপ— 'আমাদের দল বিশ্বাস

করে যে ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের সাংস্কৃতিক মর্যাদার সঠিক মূল্যায়ন ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। ভারতের প্রকৃত পুত্র-কন্যাগণ যে এই ভাবনায় গর্ববোধ করে যে প্রাচীনকাল থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার লাভ করেছি তা অত্যন্ত উদার ও চিরন্তন, তাকে কখনই বদ্ধ ও অধঃপতিত হতে দেওয়া যাবে না।

স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎকে ভারতীয় আদর্শগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাখতে হবে এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগের অনুকূলে প্রয়োজনমতো তার সংস্কার ও পরিবর্তনও করে যেতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও তার যথাযথ প্রতিফলন হওয়া আবশ্যক। আমরা যখন 'ধর্মরাজ্য' অর্থাৎ আইনের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখেছি তখন আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য পরম্পরাকেই পালন করে চলি যা সমস্ত মানুষকে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।'

প্রধানমন্ত্রী নেহরু শ্যামাপ্রসাদ ও জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনেছিলেন তাকে খণ্ডন করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন--- 'মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বেদীমূলে বারবার ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তা বলি দিয়ে এবং দেশ বিভাগের পরেও পাকিস্তান সরকারের খেয়ালিপনা ও চিৎকারের সামনে আত্মসমর্পণ করার পর অন্যদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপন করা শ্রী নেহরুর মুখে শোভা পায় না। ভারতের শ্রী নেহরু ও তার বন্ধুরা আগামী নির্বাচনে ভোটে জয়লাভের লালসায় যে মুসলিম তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা ছাড়া কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই।'

সাংস্কৃতিক জাতীয়তার কারণেই তিনি ভারত বিভাগ যেমন মেনে নিতে পারেননি, ঠিক তেমনই নেহরু ও আবদুল্লার কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার নীতিও মানতে পারেননি, যার জন্য কাশ্মীর অভিযান করে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। যে মৃত্যু আজও রহস্যজনক যেমন সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (আসলে মুখ্যমন্ত্রী) সেখ আবদুল্লার চুক্তি হয়েছিল যে— (১) কাশ্মীর রাজ্যের উপর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকবে, (২) জম্মু-কাশ্মীর সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে ওই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন না, (৩) ওই রাজ্যের নিজস্ব পতাকা থাকবে, (৪) রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত হবেন রাজ্যের আইন পরিষদের পরামর্শে।

১৯৫১ সালের জুলাইয়ে এই চুক্তি হয়। নেহরু ও আবদুল্লার এই জাতীয়তা বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ, সাংস্কৃতিক জাতীয়তায় আস্থাশীল শ্যামাপ্রসাদ মেনে নেননি। তাঁর আন্দোলন ছিল— একই দেশে দুই বিধান, দুই নিশান ও দুই প্রধান নীতির বিরুদ্ধে।

শ্যামাপ্রসাদের সমগ্র রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রয়োজনে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তার স্বার্থে। তিনি কখনও হিন্দুদের প্রবক্তা হতে চাননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং বঞ্চিতদের চোখের জল মোছাতে তিনি হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কোনো ধর্মীয় পরিত্রাতা হিসেবে নয়। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ, ভারতীয় সংস্কৃতি মানেই হিন্দু সংস্কৃতি। তাদের নিজেদের দেশেই তারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হবে— এটা শ্যামাপ্রসাদ মেনে নেননি।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে, বিশেষত তাঁর সৃষ্ট এই পশ্চিমবঙ্গেই, দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করা হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দলের আনুকূল্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তিরই সম্মান জোটে না। দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত দলটিকে, যার বর্তমান নাম ভারতীয় জনতাপার্টি— পর্যুদস্ত করতে হলে শ্যামাপ্রসাদের সমগ্র কর্মজীবনের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে তাঁকে এক হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তা হিসেবে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এবং চরম ঘৃণায় তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তার প্রবক্তা। আজকালকার রাজনীতি ব্যবসায়ীরা এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বোঝেন না। তাঁরা মাত্র ৮০০ বছরের পুরনো পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ নিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যা করেন।

শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন ছিল যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে ও তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষা করে ভারতে তার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভাবেই ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয়তাকে আঘাত করা তিনি বরদাস্ত করেননি।

তাঁর বিশ্বাস ছিল : Force must, in the last analysis, be met with force. An internal policy of non-resistance to armed violence would eventually condemn any society to dissolution। অর্থাৎ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করলে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন যখন দাসপ্রথা বিরোধিতায় নেমেছিলেন তখন সিভিল ওয়ার-কে ভয় পাননি। সিভিল ওয়ার অহিংসা দিয়ে জেতা যায় না। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ প্রয়োজন হয়েছিল— নিজের দেশের মধ্যেই। লিঙ্কন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই করেছিলেন এবং জিতেছিলেন। আজ আমেরিকা অক্ষত, আমেরিকা সুপার পাওয়ার। আমাদের দেশ নেতারা সিভিল ওয়ারের ভয় পেয়ে দেশবিভাগ মেনে নিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি হলো।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বিপন্ন হলে গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ার করেও তা রক্ষা করা উচিত। শ্যামাপ্রসাদের এই বাস্তববুদ্ধি অন্য নেতাদের ছিল না। তাই লিঙ্কনের নেতৃত্বে আমেরিকা আজ যে পর্যায়ে গেছে, ভারতবর্ষ সে অবস্থায় যেতে পারেনি। ▌

With best Compliments from :

Manufacturer of ***Bulk Drugs & Chemicals***

Kothari Phytochemicals & Industries Limited

C-4, Gillander House, 8, N.S. Road, Kolkata - 700 001

Works at.

PHYTOCHEMICALS DIVISON - MADURAI

Vill- Nagari. P.O. - Thanichchiyam

Dist.- Madurai

Pin - 625 221, Tamil Nadu, India

CLARO INDIA DIVISON

B-7, Sipcot Industrial Complex, Gummidipoondi

Pin - 601 201, Tamil Nadu, India

SOUTHERN SYNTHETICS DIVISON

No. 14, Sipcot Industrial Complex, Ranipet

Pin - 632 403, Tamil Nadu, India

শাশ্বত ভারতচেতনার মূর্ত প্রতীক

শ্যামাপ্রসাদ ও নজরুল

চিত্তরঞ্জন পাত্র

ভারতবাসীর সৌভাগ্য শ্যামাপ্রসাদের মতো একজন দেশ কর্মী, উচ্চ শিক্ষিত, উদারচেতা এবং সাহসী মানুষকে পেয়েছিল। তিনি পিতা আশুতোষের মতো তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাবুদ্ধি এবং মাতা যোগমায়া দেবীর ধর্মপরায়ণতা, ক্ষমা, করুণা, সহিষ্ণুতা, দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-সহ সমস্ত মানবিক গুণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর তুলনা হয় না। প্রায় সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলা, ইংরেজি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। এই প্রতিভাধর মানুষটি মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ক্রমান্বয়ে দু'বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। আরো এক আশ্চর্য এবং সাহসিক পদক্ষেপ করেছিলেন ভারতীয়দের মনোজগতে। তিনিই সর্বপ্রথম পূর্বের সব প্রথাকে ভেঙে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছিলেন ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলা ভাষায় দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্য। সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম, রাজনীতি, মন্বন্তরের সময় স্বহস্তে অসংখ্য লোকের সেবা, অন্নদান, বস্ত্রদান করতে তিনি সকলের আগে ছিলেন। সমকালে নজরুলও ছিলেন অনেক প্রতিভার অধিকারী। দেশকে ভালোবাসতে হলে জাতিকে ভালোবাসতে হয়। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ইংরেজি রিলিজিয়ান' শব্দের ঘেরাটোপে যে হিন্দুধর্মকে বাঁধা যায় না, হিন্দু সে অর্থে কোনো সম্প্রদায়গত ধর্ম নয়। ভারতবর্ষে হিন্দু বলতে বোঝায় একটা জীবনদর্শনকেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক

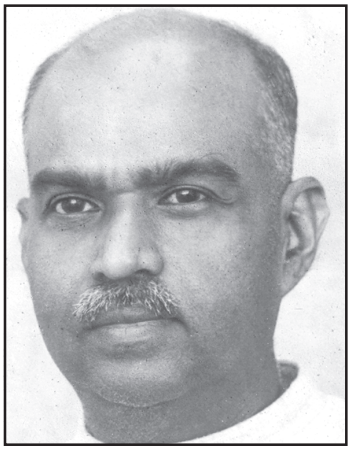

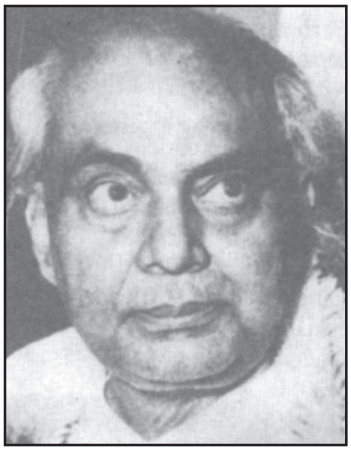

ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত পরস্পরের একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।'

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও যেমন হিন্দু চিত্তের অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমান হয়েও ছিলেন হিন্দু চিত্তের অধিকারী। তাই তিনি একটি চিঠিতে ইব্রাহিম খাঁকে লিখেছিলেন, 'আমার মুসলমান সমাজ (আমাকে) কাফের খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। ...হিন্দুরা লেখক অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমায় এতো বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সেই ঋণকে অস্বীকার যদি করি তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবেন না।' এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে নজরুলের বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কারণ অনেকেই শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় ভূষিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। অথচ শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতে রাখা সম্ভবই হোত না। দেশ ভাগের পর খণ্ডিত ভারতকে দ্বিতীয়বার বিভাজনের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। যাই হোক, একবার নজরুল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেবার তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদই। নজরুলের কথাতেই বলা যায়, 'আপনি এতো সত্বর ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হোত।' ১৯৪২ সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন নজরুল দুঃখে জীবনযাপন করছেন এবং তখন তাঁর বাজারে ঋণ প্রায় কয়েক হাজার টাকা। স্ত্রী প্রমীলাদেবী পঙ্গু ও শয্যাশায়ী। তখন বাংলায় ফজলুল

হকের মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদও মন্ত্রী ছিলেন। ফজলুল হক প্রতিশ্রুতি দিয়েও (নজরুলকে) কথা রাখেননি কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ কবির দৈন্যদশা সহ্য করতে না পেরে কবিকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে আর্থিক সাহায্য ছাড়াও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য মধুপুরে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি নজরুল শ্যামাপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

মধুপুর-১৭.৭.১৯৪২

শ্রীচরণেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। মধুপুরে এসে অনেক relief এবং relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হোত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবলিওয়ালাদের কাছেই বেশি। হকসাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, 'আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না, 'আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণ লীডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর অ্যাসেম্বলির সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। 'নবযুগের' সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিল্মের মিউজিক ডিরেকশন-এর জন্যে সাত হাজার টাকার কনট্রাক্ট পাই। হক সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু মুসলমান সাপোর্টার আমায় বলেন যে, তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি ফিল্ম-এর কনট্রাক্ট ক্যানসেল করে দিই। পরে যখন দু' তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক সাহেবকে বললাম, আপনি কোনো ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমার ঋণ করে দেন আমার মাইনের অর্ধেক প্রতিমাসে কেটে রাখবেন। হক সাহেব খুশি হয়ে বললেন, 'পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব।' তারপর সাতমাস কেটে গেল, আজ নয় কাল নয় করে তাঁর সাপোর্টাররাও উদাসীন হয়ে রইলেন। হিন্দু মুসলিম ইউনিটির ক' লাখ টাকা মঞ্জুর হলো, সে টাকা যখন হক সাহেব পেলেন, তখন তিনি বললেন, 'কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে'। আপনিও আমাকে বললেন 'ও হয়ে যাবে।' আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করলাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান ইউনিটি-এর জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে সব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে— সে গান বাংলার হাটে, ঘাটে, পল্লীতে নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি, যদি হক মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তাহলে আবার কোয়ালিশন মিনিস্ট্রির জন্য। হক সাহেব একদিন বললেন, 'কিসের টাকা?' আমি চুপ করে চলে এলাম। তারপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি সেক্রেটারিয়েট-এ যখন বলেছিলেন, 'ও হয়ে যাবে।' তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম। আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব— সেদিন বাঙালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে— আপনারাই হবেন এদেশের সত্যিকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি, আমি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি ফান্ড থেকে আমার ঋণমুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশো টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশো টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচশ টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়তো Body Warrant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আপনার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য্যসাহস— আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম-পদ্মশ্রী চরণে গ্রহণ করুন।

প্রণত : কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন মনে প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক তেমন শ্যামাপ্রসাদও।

কাজী নজরুল নিজ ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের বিশ্বাস করতেন না কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাদের মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ১৯৩৪ সালে 'সওগাত' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— 'হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ ত্রুটি কুসংস্কার নিয়ে কিনা কশাঘাত করেছেন সমাজকে— তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজে শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই (এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ বর্তমানের বাংলা লেখিকা তস্‌লিমা নাসরিন এবং ইংরেজি লেখক রুশদি)। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দু জাতি যে এক নব বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।"

নজরুল যেমন তাঁর ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসভাজন ছিলেন না, তেমনই শ্যামাপ্রসাদের মতো মহান জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন নেতাকে হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের গদিলোভী নেতা বিশ্বাস না করায় ভারতকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হতে হলো আর কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও বিচ্ছিন্নবাদীদের হাতে তার শাসনভার অর্পিত হবার কারণে শ্যামপ্রসাদের অকালে আত্মবলিদান দিতে হলো। এই ঘটনা আমাদের জাতির কলঙ্ক রূপে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে কালো অক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে। ▌

হিন্দু সমাজের দাবি : শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য উন্মোচিত হোক

মণীন্দ্রনাথ সাহা

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তিরিশের দশকের শেষের দিকে। ১৯৩৯ সালে বীর সাভারকারের সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পরের বছর হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৪০ থেকে '৪৭ সময়কালে শ্যামাপ্রসাদ জাতীয়তাবাদী নেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন। অনেকের হয়তো জানা নেই মুসলিম লিগের ভারত ভাগের দাবির (লাহোর, ২৩ মার্চ, ১৯৪০) বিরুদ্ধে প্রথম যে কণ্ঠটি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল, সেটি ড. শ্যামাপ্রসাদের।

ফজলুল হককে সঙ্গে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন গড়ে তুললেন। গঠিত হলো শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা। সেই মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শ্যামাপ্রসাদ, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতাদের কারারুদ্ধ করে বৃটিশ শাসকের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে তিনি বাংলার অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঘৃণাভরে পদত্যাগপত্রখানা বৃটিশ লাট স্যার জন হার্বাটের মুখের উপর ছুঁড়ে দেন। আট বছর পর ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে যে নির্বিচারে যে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নারী নির্যাতন চলে, তার বিরুদ্ধে নপুংসক নেহরু সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শ্যামাপ্রসাদ ঘৃণাভরে নেহরু মন্ত্রীসভার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে সর্বহারা

উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ান। ক্ষমতা ও পদলোভী এই শিয়াল-শকুনের দেশে নীতি ও আদর্শের সঙ্গে কোনো প্রকার আপোশ না করে, পরপর দু'বার মন্ত্রীপদ ত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর কাশ্মীর প্রশ্নে দেশের স্বার্থে তিনি যে নিজের জীবনটাই ত্যাগ করে গেলেন, সেই সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের কথা কোনো কোনো নিমকহারাম বাঙালি ভুললেও প্রকৃত দেশপ্রেমিক ভারতবাসী কোনোদিন ভুলবে না। (দীনেশচন্দ্র সিংহ— ভূমিকা : শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ পৃ. xxii)

১৯৪৬ সালের ১৬, ১৭, ১৮ আগস্ট মুসলিম লিগের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ সোহরাবর্দি'র নির্দেশে আজরাইলবাহিনী অবাধে কলকাতা শহরে হিন্দু-শিখ নিধন করে। চলে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। পাঁচ হাজার হিন্দু-শিখ, পুরুষ-নারী নিহত হয়। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, ''লর্ড ওয়াভেল বলেছিলেন— 'পলাশীর যুদ্ধের থেকেও বেশি লোক মারা যায় কলকাতার দাঙ্গায়।' 'কলকাতা শহরে যখন নির্বিচারে নারী ও পুরুষ খুন হচ্ছিল, তখন পুলিশ-মিলিটারি চুপ করে ছিল' (ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম— আবুল কালাম আজাদ)। লিউনার্ড মোসলে তাঁর দ্য লাস্ট ডেজ অফ বৃটিশরাজ গ্রন্থে লিখেছিলেন— '১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের ওই কুৎসিত ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড কলকাতাকে ৭২ ঘণ্টার জন্য বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। চৌরঙ্গী স্কোয়ারে নারী, পুরুষ, শিশুর পচাগলা দেহগুলি নর্দমায় পড়েছিল। শকুন ঠুকরে খাচ্ছিল লাশগুলি। এই ঘটনাই ভারত ইতিহাসের গতি বদল করে দিয়েছিল'।

জিন্নার মুসলিম লিগ যখন কলকাতায় এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল তখন জওহরলাল নেহরু মুম্বইতে জিন্নার সঙ্গে ঠাণ্ডাঘরে বৈঠকে বসে রাজনৈতিক দরকষাকষিতে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই যখন মুসলিম লিগের এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করছেন, গান্ধী তখন বললেন, 'আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।' তিনি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আরও বললেন— ''আমরা ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যাই। এটা উচিত নয়। যারা পালিয়ে যায় ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর যখন আমাদের অন্তরে আছেন, তখন পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ যখন মারা যায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এটা ঘটে। আমাদের যদি কেউ পেটায়, তখন

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

বুঝতে হবে ঈশ্বরই এটা ঘটান।”

অপমানিত, লাঞ্ছিত নোয়াখালির হিন্দু নারীদের প্রতি গান্ধীজী উপদেশ দিলেন— ‘তারা যেন তাদের অত্যাচারীদের বাধা না দেয়।’ কারণ তাহলেই নাকি ওইসব মনুষ্যরূপী পশুদের মনে মানবতার উন্মেষ ঘটবে। তিনি এও বলেছিলেন— ‘মেয়েদের জানা উচিত কীভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং কোনো প্রকার ওজর- আপত্তি করা ঠিক হবে না। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হবে।’ নোয়াখালির হিন্দুদের প্রতি তাঁর আরও অভিনব অহিংসার হিতবাণী ছিল যে— ‘তাঁরা যেন কখনই অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ না করে। বরং তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর তরবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে’ (Statesmen, 18.10.46)।

১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে লক্ষ্মীপুজোর দিন নোয়াখালিতে গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে শুরু হলো ভয়াবহ হিন্দু নিধন। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। গ্রামের পর গ্রাম অবাধে হত্যা, লুঠতরাজ, গণধর্ষণের ঘটনা চলল। তিন হাজার হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ মারা গেল।

শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম প্রধান মুসলিম রাজনীতিক আব্দুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন— ‘‘আমি শ্যামাপ্রসাদের সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছেন তা ঠিক। হিন্দুসভার নেতা হইয়াও কোনো হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়া।”

দেশভাগ অনিবার্য দেখিয়া শ্যামাপ্রসাদ চাইলেন সমগ্র বাংলার যে অংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অংশটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে। তিনি এই দাবি নিয়ে কংগ্রেস ও অন্য হিন্দু নেতাদের কাছে গেলে তাঁরা এই দাবি মেনে নিলেন। এমনকী মাউন্টব্যাটেনও শ্যামাপ্রসাদের দাবিকে মেনে নিয়ে পাঞ্জাব এবং বাংলাভাগের সিদ্ধান্তে রাজি হলেন। জিন্না যখন বুঝলেন বাংলা ভাগ হয়ে কলকাতা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে, তখন তিনি ইংরেজ প্রভুদের পায়ে ধরনা দিয়ে জোড়হস্তে মিনতি জানালেন— “Please, do not give me moth-eaten Pakistan.” (দয়া করে আমাকে পোকাকাটা পাকিস্তান দিবেন না)। যার জন্যে গর্বভরে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন--- ‘জিন্নাহ ভারতকে ভাগ করেছেন আর আমি পাকিস্তানকে ভাগ করে দিয়েছি।’ পশ্চিমবঙ্গের জন্মই হয়েছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালির নিজস্ব আবাসভূমি হিসাবে, বিজাতীয়দের এখানে লম্ফঝম্ফ করার জন্য নয়।

শ্যামাপ্রসাদ আরও দাবি করেছিলেন, পাঞ্জাব ও বাংলার সংখ্যালঘু বিনিময়ের। তাঁর এই মতকে বাবাসাহেব আম্বেদকরও সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— ‘‘একথা সন্দেহাতীত যে সংখ্যালঘু বিনিময়ই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার।” কিন্তু গান্ধী বলেছিলেন— ‘‘লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারছি না।” গান্ধী ও নেহরুর প্রতিক্রিয়ার জন্য ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন— ‘‘যখন স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দুনরনারী লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত এবং চরম দুর্দশাগ্রস্থ হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তখন পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, যত সংখ্যক হিন্দু বিতাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া নবাগত হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, ‘ইহা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাজ্যে অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বিধানচন্দ্র রায়কে নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে আসা উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পাওয়া বন্ধ করিতে হইবে।”

শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের মতো একমুখে বিভিন্ন রকম কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি সোজা কথাটি স্পষ্ট ভাষায় নির্ভয়ে বলতে কখনও দ্বিধা করতেন না। সে কারণেই কংগ্রেস, বৃটিশ, কমিউনিস্ট ও মুসলিম লিগ কোনো দলই তাঁকে সহ্য করতে পারত না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এখনও আত্মসচেতন না হলে এবং পূর্ববৎ সংখ্যালঘু তোষণবাদী রাজনৈতিক দলগুলির হাতে নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়ে টিভির সামনে সিরিয়ালে বুঁদ হয়ে থাকলে, তাদের কপালে ১৯৪৬-৪৭-এর রক্তাক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কেউ রোধ করতে পারবে না। তার প্রমাণ দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, গলাডহড়া, নদীয়া, কালিয়াচক ইত্যাদি।

১৯৬৯ সালে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন দুই প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত (যুগান্তর) ও অপূর্ব সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা)। তাঁরা শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে সময় তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। কলকাতার সাংবাদিক শুনেই তিনি বলেছিলেন, ‘‘আপনাদের ধারণা যে আমি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু আমি হত্যাকারী নই killer, আরেকজন।” তাহলে এবার জানা দরকার কে সেই হত্যাকারী? আব্দুল্লা তা অবশ্য খোলসা করেননি। তিনি 'killer' শব্দ ব্যবহার করে মেনে নিয়েছিলেন যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে গভীর মর্মবেদনা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। তবু ভারতভাগের ইতিহাস, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জন্মের ইতিহাস যতবার লেখা হবে, ততবারই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। কেননা তিনিই এই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদাতা, বাঙালি হিন্দুর তিনিই রক্ষাকর্তা। এ সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই। পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র দেশবাসী জানতে চায় কোন্ শক্তিধর ব্যক্তির নির্দেশে শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করা হয়? বর্তমান কেন্দ্র সরকারের নিকট দেশবাসী দাবি করে ড. মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য উন্মোচিত হোক। ▌

পরম্পরা

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা তাঁর অর্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথ যেমন অনাদি, অনন্ত, অক্ষর পুরুষ তেমনি তাঁর লীলাও বিচিত্র, ব্যাখ্যাতীত, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি-তর্কবিতর্কের অগোচর। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত আছে নানা আখ্যান, নানা ঘটনা। তাঁর আবির্ভাব যতটা রহস্যময়, লীলাও সেইরকম চমকপ্রদ। শুধু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীতে নয়, আধুনিক মানুষের অনুভবে এমন সব লীলামাধুর্য অনুভূত হয়েছে যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে বিস্ময়কর।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের করুণাধারার এমন নজির মেলে, মনে হয় জাতপাতে দীর্ণ আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রভুই সব কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি সাম্যবাদের সনাতন ঈশ্বর। দাসিয়া বাউরিকে নিয়ে এরকম একটি আখ্যানে ফুটে উঠেছে প্রভুর অঘটন-ঘটন লীলাবিলাস।

পুরী থেকে দু'কিলোমিটার দূরে বালিগ্রাম। এখানে বাস করে দাসিয়া বাউরি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রভু জন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। সে দীন, হীন, তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ।

দাসিয়া লেখাপড়া শেখেনি। শাস্ত্র পড়ার কথা নয়। তত্ত্ব বোঝে না। কিন্তু গ্রামে উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র পাঠ করলে দাসিয়া সেখানে হাজির হয়। শাস্ত্রকথা বুঝুক আর নাই বুঝুক সে শোনে, তার ভাল লাগে, বড়ো আনন্দ পায়। শ্রবণে তৃষ্ণা বাড়ে, আরও শুনতে সাধ হয়, আর খেদ জাগে— 'আমি তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। আমার হরিভক্তি কী করে হবে?' প্রতি বছর রথযাত্রা উপলক্ষে দাসিয়া পুরীধাম যায়। রথারূঢ় বলরাম, সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে। তখন তার এত আনন্দ হয় যে দু' চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে।

বাড়ি ফিরে এসে দাসিয়া অন্যান্য যাত্রীদের মতো জগন্নাথদেবকে বেবাক ভুলে গিয়ে সংসারের কাজে-কম্মে ডুবে যেত না। সব সময় তার হৃদয় জুড়ে বিরাজ করত পদ্মপলাশলোচন চক্রপাণি শ্রীজগন্নাথ। দিনরাত, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে জগন্নাথের কথা ভেবে ভেবে তার সময় কাটে।

এক রাতে স্বপ্নে দাসিয়া তার ভগবানের দর্শন পেল। পীতবাস শ্রীহরি তাকে বললেন— 'দাসিয়া, তুমি সারাক্ষণ আমার কথা ভাব। আমার চিন্তা ছাড়া তুমি থাকতে পার না। যখন তুমি পুরী যাবে, তুমি মন্দিরের চূড়ায় নীলচক্রের দিকে তাকাবে, সেখানে তুমি আমার দেখা পাবে।' দাসিয়া এর পর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন বাসনায় পুরী যাত্রা করল। ভাবল, শুধু হাতে কি দর্শন করা যায়? কিছু ফল কেনা যাক। গ্রীষ্মকাল। চোখে পড়ল এক জায়গায় এক ফল বিক্রেতা সুন্দর সুন্দর আম বিক্রি করছে। ভাল ভাল দেখে দাসিয়া তার কাছ থেকে প্রায় এক ঝুড়ি আম কিনল। তারপর হাঁটা ছিল মন্দিরের দিকে। সিংহদ্বারে পৌঁছানোমাত্র কয়েকজন পাণ্ডা তার সঙ্গ নিল। তারা জানে, এসব আম প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত হবে মাত্র, আসলে তারাই এসবের উপভোক্তা। যার মাধ্যমে নিবেদিত হবে, ফলের মালিকানা তারই। এই নিয়ে পাণ্ডারা নিজেদের মধ্যে বিশ্রী বচসায় লিপ্ত হলো। তখন দাসিয়া সামনে এসে বিনম্রভাবে হাতজোড় করে তাদের বলল— 'আপনারা বিবাদ করবেন না, আমিই প্রভুকে নিবেদন করব'।

—'কিন্তু, ওহে, তুমি কী করে নিবেদন করবে? নিবেদন করব তো আমরাই। এ তো আমাদের কাজ'।

পাণ্ডাদের কথায় পাত্তা না দিয়ে দাসিয়া ফুলের ঝুড়িটি মাটিতে রেখে নীলচক্রের দিকে তাকাল। সেখানে চাক্ষুষ করল শ্রীজগন্নাথকে। দাসিয়া দুটি হাত বাড়িয়ে বলল— 'দয়াময় প্রভু, এই ফলগুলি তুমি কৃপা করে গ্রহণ কর। তোমার জন্যই এনেছি। দেখ, ঠাকুর, তোমার এই পাণ্ডারা কী রকম বিবাদ করছে, প্রভু তুমি গ্রহণ কর'।

এই বলে একটি একটি করে আম দাসিয়া জগন্নাথের উদ্দেশে তুলে ধরে আর তৎক্ষণাৎ সে ফল অন্তর্হিত হয়। এইভাবে ঝুড়িসুদ্ধ আম নিঃশেষিত হলো।

পাণ্ডারা তো অবাক। আমগুলো যাচ্ছে কোথায় এ কি দেখার ভুল না ভেল্কি? ভেল্কি যদি হয় তবে মানতে হবে ভালই ভেল্কি দেখাল লোকটা। বোকা বানাল। রাগ হলো দাসিয়ার উপর। প্রভু নাও! গ্রহণ কর! প্রভু যেন রক্তমাংসের মানুষ! দাসিয়ার হাত থেকে হাত বাড়িয়ে আম খেলেন আর তারা কিছুই

বুঝল না। কিন্তু তাদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে তারা লক্ষ্য করল রত্নবেদির নীচে শুধু আমের খোসা আর আঁটি। তারা তো নির্বাক। কোনো জাদু নয়, দৃষ্টিভ্রম নয়, ভক্তের দেওয়া ফল প্রভু আস্বাদন করেছেন!

খোঁজো সেই পরম ভাগ্যবানকে। পরম তৃপ্ত দাসিয়া মহানন্দে তখন তার বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

তিনি জগতের নাথ। কিন্তু দীন-হীনের প্রতি কি তিনি বেশি মমতাপরায়ণ? আসলে তিনি ভাবগ্রাহী। 'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'— তিনি জগদীশ্বর হয়েও ভক্তির কাঙাল। তিনি অভিমানী দুর্যোধনের সুবর্ণ থালায় নিবেদিত রাজভোগ উপেক্ষা করে ভক্ত বিদুরের গৃহে সামান্য দুটি অন্ন পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ধনী-পণ্ডিতরা তাদের অভিমান-অহঙ্কারের জন্যই প্রভুর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন :

দীনেরে অধিক কৃপা করে ভগবান।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড়ো অভিমান।।

এরকম এক ধনী হায়দরাবাদ থেকে এসেছেন। তিনি কোটিপতি। শেঠজী নামেই পরিচিত। জগন্নাথের ভক্ত। কিন্তু ধনের অহংকারও আছে। জগন্নাথধামে আসার পর তিনি বেশ জাঁক করে বলে বেড়াচ্ছেন— তিনি লাখ টাকার ভোগ দেবেন। দু' পাঁচ হাজার টাকার নয়— একেবারে লক্ষ টাকা এ যে সময়ের কথা তখন প্রভুর ছাপান্ন ভোগ চালু থাকলেও তার আর্থিক মূল্য লাখ টাকা ছিল না।

তাই সেবায়েত, দইতাপতি, পাণ্ডার দল চিন্তায় পড়লেন। এক লাখ টাকার ভোগ পুজিয়ে দেওয়া কীভাবে সম্ভব! সমবেত ভাবে বসে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। এদিকে শেঠজীও তাড়া দিচ্ছেন। তিনি ব্যস্ত, ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁকে অচিরেই হায়দরাবাদ ফিরে যেতে হবে। নষ্ট করার মতো সময় তো তাঁর হাতে নেই। কাজেই দেরি নয়। যত শীগগির সম্ভব, এক লাখ টাকার ভোগের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

শেষে ঠিক হলো, মহাপ্রভুকেই জানানো হোক। কিন্তু মহাপ্রভু তো রত্নবেদির উপর নরদেহ নিয়ে বসে নেই, তিনি তো দারুব্রহ্ম। তাঁকে জানানো যায় কীভাবে? সে উপায়ও হলো। প্রধান পাণ্ডা প্রভুর সমীপে ধরনা দেবেন; যাকে বলে 'হত্যে' দেওয়া, তাই দেবেন প্রধান পাণ্ডা। শেঠজীর জন্য তিনি প্রভুর প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় ধরনা দেবেন।

তারপর স্নান-আহ্নিক করে, শুচি-শুদ্ধ হয়ে, শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে 'জয় জগন্নাথ' বলে প্রধান পাণ্ডা প্রভুর সামনে ধরনা দিলেন। প্রভুর আদেশও মিলল। প্রভু এক খিলি পান খেতে চান। এক খিলি নয়, তিন খিলি। ভাইবোন মিলে মোট তিন খিলি পান। পান তো প্রভু প্রতিদিনই খান। কিন্তু সেসব পান চুনবিহীন। আর চুন ছাড়া পান খেতে খেতে পানে অরুচি লেগে গেছে। তাই বড়ো সাধ চুন-দেওয়া এক খিলি পান খাবেন। কিন্তু সে চুন গেঁড়ি, ঝিনুক বা শাঁখ পোড়ানো চুন নয়। গজমোতির চুন দিয়ে তিনটি পান সাজিয়ে দিতে হবে। তারপর প্রভু বলবেন কী ভোগ তাঁর প্রিয়।

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত প্রত্যাদেশ পেয়ে পাণ্ডা ছুটলেন শেঠজীর কাছে। জানালেন মহাপ্রভুর অভিরুচি। কিন্তু শেঠজীর তো মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। গজমোতি কোথায় পাবেন? শুনেছেন হাতির মাথায় থাকে গজমুক্তা; সব হাতির মাথাতেও নয়। কটা হাতি

প্রভু জগন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত দাসিয়া।

মারলে মিলবে গজমোতি কিছুই বলা যায় না। আর কতটা মোতি পোড়ালে পাওয়া যাবে তিনটি পানের জন্য প্রয়োজনীয় চুন।

শেঠজী পড়লেন মহা আতান্তরে। মাথা থেকে মূল্যবান পাগড়ি পড়ল খসে। ছুটলেন মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে। কেঁদে ফেললেন, আভূমি প্রণত হলেন— 'প্রভু আমায় ক্ষমা কর। আমি বড়ো দীন, তোমাকে একটা পান দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। মিথ্যা আমার ঐশ্বর্য, ধন-দৌলত। সব তুচ্ছ, ক্ষমা কর প্রভু। আমায় ক্ষমা কর। প্রভুর চোখে কি তখন কৌতুক-কটাক্ষের মৃদু বিচ্ছুরণ? তাঁকে যে জগতের লোক দর্পহারী বলে, তা তো আর মিথ্যা নয়। ▌

With Best Compliments from -

Sakshi Exports (P) Ltd.

Regd. Office : First Floor,
Room No. A-16,3 Bentinck Street,
Kolkata - 700 001
Tin No. : 20381700604,
DH-731 (C) CIN - U36101WB1998PTC087250
Phone (O) 2301018,
Email : sakshiexports@gmail.com

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
TURMERIC POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

ঐতিহাসিক দ্বিধা

ভূতপূর্ব বিদেশ সচিব এম কে রাসগোত্রা ষড়যন্ত্রের গন্ধ ছড়ানো প্রশ্ন তুলেছেন— আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগেই কি এই দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলা যেত না?

অতিথি কলম

স্বাগত গাঙ্গুলী

অতি সম্প্রতি আমেরিকার সাংসদের যৌথ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মনোমুগ্ধকর বক্তৃতায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন— ভারত ও আমেরিকা তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক দ্বিধাগুলিকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিদেশ সচিব রাসগোত্রা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এক বিশ্লেষণে জানিয়েছেন— এই দ্বিধাগুলি যা অনায়াসে ৫০ বছর আগে এড়ানো যেত সেক্ষেত্রে দেশ বিরাট সুবিধেজনক জায়গায় থাকতো।

> **বিশ্বের তাবড় শক্তিগুলি যখন হাতের তেলোয় করে ভারতকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে দেয় তখন মহান নেহরু তা অস্বীকার করে চীনকে সেই সুযোগ পাইয়ে দেন। এটিই ছিল ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম আত্মপ্রত্যয়হীনতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।**

আজ ভারতকে বিশ্বের পরমাণু শক্তি সরবরাহকারী (এনএসজি) দেশগুলির কাছে মাথাকুটে মরতে হচ্ছে যাতে তারা ভারতকেও এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্যপদ দেয়। অতীতে ভারত তার নীতিতে সঠিক দিশা আনতে পারলে আজ এসবের কোনো প্রয়োজনই পড়ত না। রাসগোত্রা তাঁর পর্যবেক্ষণে তথ্য সমৃদ্ধভাবে জানিয়েছেন যে ৬০-এর দশকের মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে ১৯৬৪ সালে চীনের পরমাণু শক্তিধর হওয়ার আগেই ভারত সরাসরি পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রসঙ্গে রাসগোত্রার কথা আমার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়।

বাস্তবে কেনেডিই সর্বাপেক্ষা বেশি ভারতঘেঁষা মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি সব সময় মাও জে দং-য়ের চীনের থেকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভারতকে শক্তিশালী করে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট চীনকে মুক্ত পৃথিবীর কাছে ভয়ঙ্কর বিপদ বলে মনে করতেন। আজকে এনএসজি-র সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে আবার আমেরিকা ভারতের পাশে থাকতে সচেষ্ট। এর কৌশলগত দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা কখনই চায় না এশিয়ার সবকিছুতেই চীন আধিপত্য করুক। বিশেষ করে সাগরগুলির নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র চীনের হাতে চলে না গিয়ে যেন উন্মুক্ত থাকে।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল ছিলেন বরাবরের ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী ও মোহগ্রস্ত শান্তিবাদী, যার ফলে যে-কোনো পারমাণবিক পরীক্ষা বা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি রে রে করে শান্তি-বারি নিয়ে দেখা দিতেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন যে সময়ে ইংরেজ ও মার্কিনরা পরস্পরের মিত্র ছিল। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভারতবিরোধী চার্চিলকে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট তদ্বির করেছিলেন।

অন্যদিকে সমগ্র এশিয়ার ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে নেহরুর এক ধরনের মোহগ্রস্ততা ছিল। তিনি ভারতের জাতীয়তাবোধকেও এই বৃহত্তর এশীয় ভ্রাতৃত্বেরই একটি অঙ্গ বলে কল্পনা করতেন। এই মানসিক অবস্থানের ফলে সমগ্র Pan-Asian পটভূমিতে বিচারের প্রবণতায় চীনের আধিপত্যকে তাঁর মেনে নিতে অসুবিধে

ছিল না। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তিগুলির ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তি হিসেবে চীন তাঁর মোটেই অপছন্দের ছিল না। এই কারণগুলি গভীর ভাবে তাঁর মানসিকতায় নিহিত থাকায় এটা খুবই স্বাভাবিক যে যদি কেনেডি তাঁকে যথার্থই পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকতেন, সেক্ষেত্রে নেহরুর কাছে তা বাতিল করাটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণাম। আর বলতে দ্বিধা নেই, চীনের প্রতি নেহরুর এই ব্যাখ্যাহীন স্নায়বিক দৌর্বল্যই ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপগুলিকে প্রায় খ্যাপামির পর্যায়ভুক্ত করে তোলে।

বিশ্বের তাবড় শক্তিগুলি যখন হাতের তেলোয় করে ভারতকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে দেয় তখন মহান নেহরু তা অস্বীকার করে চীনকে সেই সুযোগ পাইয়ে দেন। এটিই ছিল ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম আত্মপ্রত্যয়হীনতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। আর এই সংশয়-সংকোচভরা আদি নীতিই ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেয়। কিন্তু ইতিহাস প্রবাহিত হোত সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিতে যদি নেহরু কেনেডির ইচ্ছায় সায় দিয়ে ভারতকে সেই ৬০-এর দশকের শুরুতেই পারমাণবিক শক্তিধর করে তুলতেন। এই সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ঝরে পড়ত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক দ্বিধা।

আর চীনেরও হিম্মত হোত না ১৯৬২ সালে পরমাণু শক্তিধর ভারতকে আক্রমণ করার। কিন্তু ঘটল উল্টোটা— চীন ভারত আক্রমণ করল আর বিভিন্ন সীমান্তে এমন মার দিল যে ভারতের রুখে দাঁড়াবার মানসিকতাটাই ভেঙে পড়ল। শুরু হলো যে-কোনোভাবে চীনের তুষ্টিকরণ বা তাকে না চটিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস। আর এই মানসিক হীনমন্যতাই ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

'৬২-এর যুদ্ধে ভারতকে নাস্তানাবুদ হতে দেখে পাকিস্তান বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। দুদ্দাড় করে '৬৫ সালে যুদ্ধের অ্যাডভেঞ্চার শুরু করে যদি কাশ্মীর হাতিয়ে নেওয়া যায়। তাই রাসগোত্রার কথা একেবারেই সঠিক যে চীনের আক্রমণ না হলে পাকিস্তান যুদ্ধও হোত না। কোনোদিন পাকিস্তান কাশ্মীরে দাঁত ফোটাতে পারবে না এ সত্যটাও তাদের মনে গেঁথে যেত। ফলে উভয় দেশের মধ্যে কাশ্মীরকে ঘিরে সমস্যা সৃষ্টি করার উদ্যোগেও চিরকালের মতো জলঢালা হয়ে যেত।

আচ্ছা, এতক্ষণের পর্যালোচনা কতটা যুক্তিসঙ্গত? এ প্রশ্ন আপনি তুলতেই পারেন। ভারতের কাছে পারমাণবিক শক্তি আছে জানলেই মাওয়ের চীন একবারে ভয়ে তটস্থ হয়ে যেত, এটা অতিসরলীকরণ। তাহলে আর একটা একেবারে ইতিহাসের আঁতুড়ঘরের কাহিনি বলা যেতে পারে। ১৯৬০ সালে মাওয়ের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লী সফর করেন চৌ এন লাই। তখনই তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে পূর্ব-পশ্চিম আপস হেরফেরের প্রসঙ্গ তুলে ইঙ্গিত করেন, যদি ভারত 'আকসাই চীনের' ওপর তাদের দাবি ছেড়ে দেয় তাহলে চীনও পূবের হিমালয়ের দিকে ভারতের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। এই অদল বদলের চুক্তিকে মান্যতা দিলে ভারতের কোনো ক্ষতি হোত না। দেশ কিছুই হারাতো না। আকসাই (অক্ষয়) চীন ছিল মনুষ্যবর্জিত। একটি পর্বতসঙ্কুল এলাকা যেখানে নেহরুর মতেই 'not a blade of grass grow' —একগাছা ঘাসও জন্মায় না।

সেই দ্বিধায় আক্রান্ত নেহরু কিন্তু চৌ এন লাইয়ের প্রস্তাবে সায় দিলেন না। দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে তা সঙ্কটের চরমসীমায় পৌঁছে গেল। তাহলে এই অত্যন্ত বাস্তব সম্মত প্রস্তাবনাটি যদি নেহরু মেনে নিতেন সেক্ষেত্রে অনায়াসে এড়ানো যেত '৬২-র যুদ্ধ। বৃহত্তর ফলশ্রুতিতে ভারত অনায়াসে ব্যবহার করতে পারতো সেরা মার্কিন প্রযুক্তি ও পুঁজি। ভারতের গতিবিধি ও অনায়াস অধিকার থাকতো বিশ্ববাজারে, কেননা সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিমণ্ডলে ভারতের মতো বড় গণতন্ত্রকে পাশে পেতে মার্কিন প্রশাসন দরাজ হাতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করত। আগেই আলোচিত চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নেই। যুদ্ধ হয়নি ভারতও হারেনি, তাই পাকিস্তানও কাশ্মীর অভিযানের দুঃসাহস দেখাতে যায়নি। ফলে ভারত চীন ও আমেরিকা দু'জনেরই গুডবুকে থাকত। কিন্তু এসব তো হয়নি যেটা হয়েছে তা হলো পাকিস্তান কায়দা করে রাজনীতির কূটকৌশলে দীর্ঘ দিন ধরে চীন ও মার্কিন দু' পক্ষকেই সফলভাবে খেলিয়ে চলতে পেরেছে। কিন্তু ১৯৯৯ সালের শতাব্দীর শেষ বছরে কারগিল আক্রমণ করে পাকিস্তান তার মুখোশ হারায়। আমেরিকা বুঝে যায় (চীন নয়) যে পাকিস্তান আসলে ভেতরে ভেতরে এক বিপজ্জনক খেলা খেলছে। তার মতলব আক্রমণ করার।

এশিয়ার দেশগুলি আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে সেই সত্তরের দশক থেকে তাদের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ফলে তাদের অর্থনৈতিক সম্পদ ফুলে ফেঁপে ওঠে। ভারত যদি সেই কাজটি অর্থাৎ অর্থনীতির বাজারিকরণ সঠিক সময়ে করতে পারত, তবে তারাও আজ চীনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারত। কখনই চীনের থেকে শত যোজন ফারাকে থাকতে হোত না। আজকের দিনে টেনেটুনে চীনের বাড়ির বৈঠকখানার আকার নেওয়ার মতো অর্থনৈতিক উন্নতি তার হয়তো ঘটেছে। আর ভারতের এমন কাণ্ডকারখানা দেখলে ঈর্ষাপরায়ণ পাকিস্তান ভারত বিরোধিতা এড়িয়ে গিয়ে অন্য এশীয় দেশগুলির মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ট্রেন ধরতে লাফিয়ে উঠত। তবে এমন সব দেশের পক্ষে হিতকর ঘটনা ঘটেনি। নেহরু তা ঘটার সুযোগ আপন মহিমায় ঐচ্ছিকভাবে হাতছাড়া করেছিলেন। ▮

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

নবাঙ্কুর

বাঘের গল্প

বাঘ যে কেমন ভয়ঙ্কর জন্তু সে কথা আর আমাদের বলে বোঝাতে হয় না। এই ভয়ঙ্কর জন্তু যে মাঝে মাঝে হাসির কাজও করে, সে কথাই আমি আজ বলতে এসেছি। দুঃখের বিষয়, গল্পগুলোর সবকটিই সত্যি কি না, এ কথা ঠিক করে বলবার উপায় নেই। তবে, এটুকু বলতে পারি যে, যারা প্রথমে গল্পগুলো বলেছিল, তারা খুব গম্ভীরভাবেই বলেছিল।

বাঘের যদি কোনোরকম খাবার না জোটে, তবে দু-একটা মাছ ধরে খেতে তার আপত্তি নেই। এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে, একবার তাঁকে নৌকোয় চড়ে কয়েক মাস সুন্দরবনে থাকতে হয়। সে সময়ে তিনি রোজ ভোরবেলায় একটা বাঘকে দেখতে পেতেন, সে জলের ধারে ধারে চলে যায়, আর মাঝে মাঝে খপ্ করে যেন একটা কিছু ধরে সেটাকে কাদায় গুঁজে রাখে। খানিক বাদে আবার সে ফিরে আসে, আর সেই জিনিসগুলো তুলে খায়। ভদ্রলোক ভাবলেন, বিষয়টা কি, না দেখলে তো নয়। তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন, শিকার করা ছিল তাঁর কাজ। তাই পরদিন ভোরবেলায় বাঘ আসামাত্রই তিনি বন্দুক হাতে তৈরি হয়ে রইলেন। বাঘ শিকার ধরে কাদায় গুঁজতে গুঁজতে যখন অনেক দূর চলে গিয়েছে, তখন তিনিও নৌকো থেকে নেমে সে পথে চললেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, বাঘ যে শিকার ধরেছে, সেগুলো ছোট ছোট মাছ। বাঘের মেজাজটা বোধ হয় একটু শৌখিন গোছের ছিল, খেতে খেতে শিকার ধরাটা সে পছন্দ করত না। তাই সে আগে অনেকগুলো মাছ ধরে নিয়ে, তারপর মনের সুখে সেগুলো খেত। যা হোক, সেদিন অন্তত তার মাছ ধরাই সার হয়েছিল, খাবার সুবিধে আর হয়নি।

আর-এক বাঘ এক বিলের ধারে গিয়েছিলেন, মাছ ধরে খেতে গিয়েই তিনি দেখলেন, জলের উপরে একটা মাছ ছটফট করছে। বাঘ মশাই তো তখনই তাকে কপ্ করে গিলে বসেছেন। সেটা যে একটা প্রকাণ্ড বঁড়শিতে গাঁথা ছিল, সেদিকে খেয়াল করেননি। বঁড়শি তো মাছের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তাঁর পেটে গিয়ে বিঁধে বসেছে; তারপর বাঘ মশাই যখন চলে যাচ্ছেন, তখন সে বলে 'কোথায় যাও?' সে রাত্রে বাঘের চিৎকারে আর আশপাশের গাঁয়ের লোকের ঘুম হয়নি। তার পরদিন সকালবেলায় তারা এসে দেখে, বাঘ বঁড়শি গিলে হাঁ করে মরে রয়েছে।

আর-এক বাঘ গিয়েছিল এক কুয়োর ধারে, বাছুর খেতে। বেটা এমন আনাড়ি ছিল যে, লাফিয়ে কোথায় বাছুরের ঘাড়ে পড়বে, না সে কুয়োর ভেতরে। তখন যে চিৎকার! কিন্তু চ্যাঁচালে কি হবে? তাতে তো আর কুয়ো থেকে উঠে আসা যাবে না, লাভের মধ্যে বাঁশ নিয়ে গাঁয়ের লোক এসে হাজির হলো। তারপর যা হলো, বুঝতেই পার।

আর-এক বাঘ গাছে উঠে বসেছিল। মতলবটা এই ছিল যে, সেই পথে গোরু বাছুর এলে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। গোরু যখন এল, তখন সে লাফ দিল বটে, কিন্তু গোরুর ঘাড়ে পড়বার আগেই পেটে বিষম বাঁশের খোঁচা লেগে তার প্রাণ বের হয়ে গেল। একটা বাঁশ কেউ ট্যারচা কোপে কেটে নিয়েছিল, তার গোড়ার দিকটা ছুরির মতন ধারালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঘ তা দেখতে পায়নি।

সান দেশে ভয়ানক বন, আর তাতে বাঘও তেমনি। সেই দেশে আমাদের একজন জরিপ করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে লোকজন অনেক ছিল, আর ছিল তার চাকর শশী। সকালে উঠেই চারটি খেয়ে জরিপে বের হতে হয়, তার আগে রান্না শেষ হওয়া চাই, তাই শশী রাত চারটায় ওঠবার জন্য ঘড়িতে 'অ্যালার্ম' চড়িয়ে রাখে। থাকতে হয় তাঁবুতে। শশীর এক তাঁবু, তাঁর মনিবের এক তাঁবু, আর সকলের আলাদা আলাদা তাঁবু। রাতে বাঘ এসে শশীর তাঁবুতে মাথা ঢুকিয়েছে। একেবারে ভেতরে আসতে পারেনি, তাঁবুর বেড়ার তলা অবদি ঢুকিয়ে ঠেলাঠেলি করছে। আর চারদিক হাতড়াচ্ছে, আর আধ হাত আসলেই শশীর মাথা পাবে। এমন সময় 'ক্ক-ড়্-ড়্-র্-র্—' শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল। বাঘ ভাবল 'সর্বনাশ! বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ল।' সে বেজায় চকে গিয়ে এমন এক লাফ দিল যে, তাতে তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে, খোঁটা উঠে একেবারে তাঁবু সুদ্ধু উলটপালট! গোলমাল শুনে সকলে ছুটে এসে দেখল, কি ভয়ানক ব্যাপার! তাঁবুর ভেতরে বাঘের বুকের দাগ আর নখের আঁচড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভগবানের দয়ায় ঠিক সময়টাতে অ্যালার্ম না পড়লে আর উপায়ই ছিল না।

"Cleanliness is next to Godliness"
- M.K. Gandhi

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

সাবধান

রেল ব্যবহারকারী ও যাত্রীগণ

ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে এবং রেল পরিসরে আবর্জনা বা থুতু ফেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

থুতু ফেলা নিষিদ্ধ

অনুগ্রহ করে রেলওয়ে চত্বরে থুতু বা আবর্জনা ফেলবেন না অথবা নোংরা জমা করবেন না। থুকদানি বা ময়লা ফেলার পাত্র ব্যবহার করুন

বাসনপত্র মাজা নিষিদ্ধ

অনুগ্রহ করে রেলওয়ে চত্বরে রান্না, স্নান, প্রস্রাব ও মলত্যাগ করবেন না, পশু-পাখিকে খাওয়াবেন না। সাইকেল /গাড়ি মেরামত বা সাফাই করবেন না এবং বাসনপত্র বা জামাকাপড় পরিষ্কার করবেন না

আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ

অনুগ্রহ করে রেলওয়ে স্টেশনের দেওয়ালে বা ট্রেনে এবং রেলওয়ে চত্বরে পোস্টার লাগাবেন না, কোন বিষয়ে লিখবেন না ও আঁকবেন না
স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের শৌচাগার ব্যবহার করবেন না

রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯ এবং ভারতীয় রেলওয়ে বিধি -২০১২ অনুসারে কোনও কর্মের দ্বারা রেলওয়ে চত্বরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ - আইন ও বিধিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য হবে।

যে কোন ধরনের নিয়মভঙ্গের পরিণাম জরিমানা

জরিমানা ₹৫০০ পর্যন্ত হতে পারে

"স্বচ্ছ ভারত মিশন"

পূর্ব রেলওয়ে

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার্থে সচেষ্ট

মনীষী কথা

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের চাঁদসীর জমিদার ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী বসুর জন্ম হয় ১৮৬১ সালে ভাগলপুরে। প্রধান শিক্ষক ব্রজকিশোর বসু ছিলেন সংস্কারমুক্ত উদার মনের মানুষ। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি গঠন করেন তিনি। এমন পিতার সন্তান কাদম্বিনী ভারতে প্রথম দু'জন মহিলা স্নাতকের অন্যতম।

কাদম্বিনীর শিক্ষা শুরু বালিগঞ্জের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। বেথুন স্কুল থেকেই ১৮৮২ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। একই বছরে ঢাকার বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা থেকে মেয়েদের মুক্ত করা, বিধবা বিবাহে সহযোগিতা, মেয়েদের জন্য কুটির শিল্পের প্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে সমাজসেবা করেছেন। বহু সন্তানের জননী, সূচীশিল্প, সাহিত্য অনুরাগ সব মিলিয়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সর্বগুণসম্পন্না।

প্রশ্নবাণ

১. প্রফেসর শঙ্কু চরিত্রটির স্রষ্টা কে?

২. ভারতীয় ক্রিকেট দলের নব নির্বাচিত কোচের নাম কী?

৩. কামাখ্যা মন্দির কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

৪. 'কালকূট' কার ছদ্মনাম?

৫. ভারত সম্প্রতি ক'টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে?

উত্তর : ১. সত্যজিৎ রায়। ২. অনিল রাধাকৃষ্ণন কুম্বলে। ৩. অসম। ৪. সমরেশ বসু। ৫. দশটি।

ছবিতে অমিল খোঁজ

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ড়ি ও অ ন য়া
(২) ড়ি ও ল য়া ঘ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) লী আ পা ম্র
(২) ও লি গ্যা লি

২০ জুন সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) অন্ধকারাচ্ছন্ন (২) জগদবল্লভ

২০ জুন সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) বালুকাময় (২) করুণাসিন্ধু

উত্তরদাতার নাম

(১) সমন্বিতা সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা (২) শুভশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা
(৩) রাজা প্রামাণিক, নাগপাড়া লেন, হাওড়া-২ (৪) তুহিন বিশ্বাস, গাজোল, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

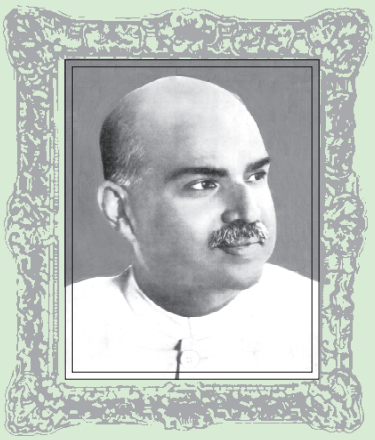

" The Country Owes an unlimited gratitude to Dr. Shyamaprasad Mukherjee for his Sacrifices for Kashmir."

A Well Wisher

(M.R.)

অন্য রকম

পাথর ফাটিয়ে জল বের করলেন বাপুরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হিন্দুসমাজে পুণ্যলাভের এক অন্যতম পথ 'জলদান' প্রথা থাকা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণদের জলপানে বা জল নিতে বাধা দেওয়ার কথা নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ এরকমই এক চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে। সাম্প্রতিককালে এরকমই এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এক গণ্ডগ্রামের অবহেলিত মানুষদের পানীয় জলের সমস্যা মিটেছে।

মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ সারা ভারতের কাছেই পরিচিত গ্রীষ্মের দাবদাহে তার ফুটিফাটা রুক্ষ মাটির জন্য; যে মাটিতে ফসল ফলাতে না পেরে আত্মঘাতী হয় হাজার হাজার কৃষক। পানীয় জলের জন্য ঘরের মেয়ে-বউদের পাড়ি দিতে হয় লম্বা পথ। এই বিদর্ভেরই ওয়াশিম জেলার কলম্বেশ্বরের গৃহবধূ সঙ্গীতা জল আনতে গিয়েছিল গ্রামেরই অন্য প্রান্তের এক কুয়োয়। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বলে সেখানকার উচ্চবর্ণের মহিলারা তাকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে

কুয়ো খুঁড়তে ব্যস্ত বাপুরাও।

দেয়। দুই সন্তান ও স্বামীর জন্য জল না আনতে পারার কষ্ট ও অপমান বুকে নিয়ে শূন্য কলসী আর জলভরা চোখে ঘরে ফেরে সঙ্গীতা। স্ত্রীর এই অপমান ও কষ্ট সহ্য না করতে পেরে সেদিনই স্বামী বাপুরাও তাজনে প্রতিজ্ঞা করে, 'জল চাইতে আর অপমানিত হবে না আমার বউ।' যেমন কথা, তেমন কাজ। নিকটবর্তী মালেগাঁও থেকে যন্ত্রপাতি কিনে আনলেন। কিন্তু হাইড্রোলজির জ্ঞান না থাকা বাপুরাও এবার পড়লেন মহা ফাঁপরে। মহারাষ্ট্রের ঊষর, পাথুরে জমিতে কোথা থেকে খুঁজে পাবেন জলভাণ্ডার! এরপর ভগবানের নাম করেই পছন্দমত স্থান খুঁজে নিয়ে খোঁড়া শুরু। কাজের শুরুতেই তাই গ্রামের লোকেদের হাসি মশকরার পাত্র হয়ে ওঠে সে। যেখানে গ্রামের অন্য তিনটে কুয়ো জলের অভাবে শুকিয়ে কাঠ, সেই কঠিন মাটির বুক ফাটিয়ে বের করবে জল! আশপাশের লোকের কাছে তাই এ বড়ই হাস্যস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পাড়া-প্রতিবেশীর অনবরত গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীও বাপুরাওকে পাগল বলতে শুরু করে। কিন্তু কারও কথায় কান না দিয়ে সকাল-বিকাল পাথুরে মাটিতে ক্রমাগত আঘাত করে গেছে; দিনমজুর বাপুরাও প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে চার ঘণ্টা, বিকেলে কাজ থেকে ফিরে দু' ঘণ্টা মাটি তোলার কাজে হাত লাগায়। অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে মুখ বুজে পাথর কেটে ৪০ দিন পরে সে জলের সন্ধান পায়।

মার্চ-এপ্রিলের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে মাটি খোঁড়ার সময় যারা তাকে পাগল বলতেও দ্বিধা বোধ করেনি, সেই তাদের মুখে এখন বাপুরাওয়ের প্রশংসা। তাদের চোখে বাপুরাও আজ নায়ক; সে কেবলমাত্র তাঁর স্ত্রীর দুঃখই লাঘব করেননি, লাঘব করেছেন প্রতিবেশীদের জলকষ্ট। এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় সঙ্গীতা বলেন, "যতদিন জল মেলেনি, অনেক খারাপ কথা বলেছে সবাই। তারপর যখন জল মিললো, সবাই হাত লাগালো।" তবে এখনও তার কাজ শেষ হয়নি। কুয়োর গভীরতা ১৫ থেকে ২০ ফুট নিয়ে যেতে চায় সে। এক সামান্য দিনমজুর, তায় অস্পৃশ্য বলে যার কপালে এতদিন অবহেলা, লাঞ্ছনা জুটে এসেছে, সেই তারই সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর দারিদ্র্যদীর্ণ কুটিরে ছুটে যাচ্ছে দেশের নামজাদা সংবাদপত্রের প্রতিবেদক ও ফোটোগ্রাফাররা।

স্থানীয় চ্যানেলে এই খবর প্রকাশ পাওয়ার পরই বাপুরাওয়ের বাড়িতে পদধূলি পড়ে পঞ্চায়েত প্রধানের। স্থানীয় এক সমাজসেবী তাঁকে ৫ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃতও করে। শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যায় বাপুরাওয়ের ছোট্ট কুটীর। মালেগাঁওয়ের তহশিলদার তাঁকে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে। এমনকী ভারতখ্যাত অভিনেতা নানা পাটেকর নিজে বাপুরাওকে ফোন করে দেখা করার কথা জানিয়েছেন। তবে এত কিছুর পরে বাপুরাও কিন্তু সেই উচ্চবর্ণদের নামে কোনো অভিযোগ জানিয়ে তাদের বিপদে ফেলতে চাননি। চাননি একে কেন্দ্র করে গ্রামে কোনো সংঘর্ষ তৈরি করতে।

অপমানের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াইয়ে জয়ী হয়ে বাপুরাও আজ তথাকথিত অবহেলিত সমাজের কাছে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। সে আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের মতো ব্রহ্মতেজ না থাকুক, চেষ্টা থাকলে তারাও পথরের বুক থেকে জল বের করে আনতে পারে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

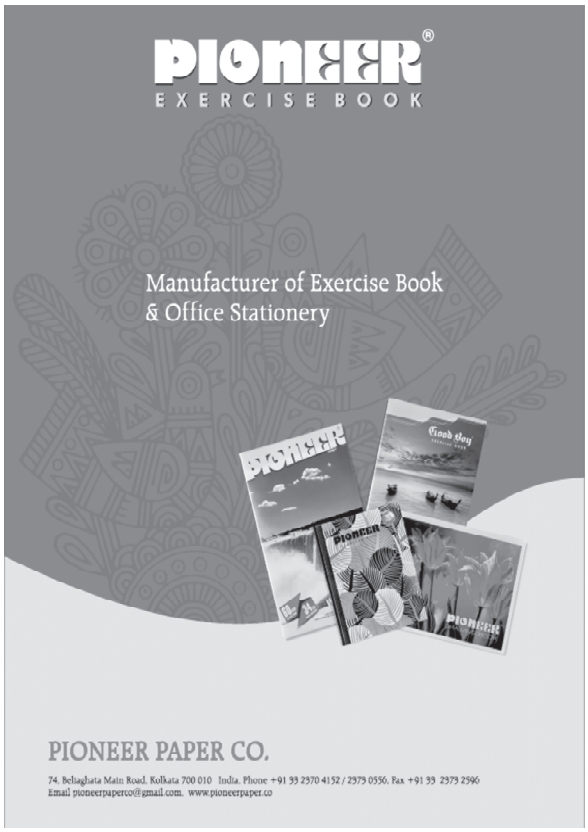

‘শঙ্করাচার্য যেন এক অধ্যাত্ম ভারতরঙ্গের উৎস, যা সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে ঘনীভূত হয়েছিল বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যে, পাঞ্জাবে শিখ গুরুদের মধ্যে, মহারাষ্ট্রে শিবাজী এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজ, মধ্বাচার্যের জীবনে। এঁদের প্রত্যেকের সহায়তায় একটি সমগ্র জাতি আত্মানুভূতির শিখরে আরূঢ় হয়। জাতীয় শক্তি ও সংহতি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে। আর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এককভাবেই পূর্ববর্তী সকল আচার্যের সমন্বয় মূর্তি।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিঠিপত্র

সাংস্কৃতিক একাত্মতা ও জাতীয়তা

আমাদের দেশের জাতীয়তার পরিচায়ক 'ভারতীয়' শব্দটি সুপ্রাচীন জাতির সামগ্রিক পরিচিতি বহন করে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়তা এবং জাতির জাতীয়তার প্রতি আদর্শগত আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই শব্দটির মধ্য দিয়ে। অথচ অনেক সময়ই 'ভারতীয়' শব্দটির অর্থ করা হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা সন্ধানী অন্বেষায় ভোটব্যাঙ্ক করায়ত্ত করার লক্ষ্য নিয়ে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তথাকথিত রাজনীতিকদের এই শব্দটির মধ্য দিয়ে মিথ্যা ও কাল্পনিক ধারণা প্রচার করার মাধ্যমে দ্বিচারিতার মানসিকতা প্রকাশ পায়। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয়তা যে হিন্দুত্ব ও হিন্দু সংস্কৃতিভিত্তিক, তা রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও ভারতবর্ষ ও হিন্দু জাতিকে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তার ভিত্তিতে এক অজেয় শক্তিরূপে গঠন করবার পথ প্রদর্শন করেছিলেন বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর। অর্থাৎ জাতীয়তা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় মনীষীদের কোনোদিন অস্বচ্ছতা ছিল না।

জাতীয়তা শব্দটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। কিন্তু অনেকসময়ই এ শব্দটির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা সাধারণ ভারতীয়দের কাছে জটিলতার সৃষ্টি করে। তবুও আমরা আমাদের এই হিন্দু জাতীয়তার পরিচয় উড়িয়ে দিতে পারি না। জাতীয়তা কোনো বাইরের বিষয় নয়, আত্মশক্তির আর জাতীয়তাবোধ অভিন্ন। এই আত্মশক্তির ভিত্তি হলো দেশ তথা দেশজ পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন। আমাদের রাষ্ট্র সনাতন। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সুরক্ষার ভিত্তি হলো সমাজের একাত্মতা এবং উদ্যমী পুরুষার্থের নিরন্তর প্রবহমাণ স্রোত। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য দরকার হিন্দুত্ব। বর্তমানে তা বেশি করে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতি হলো আমাদের অন্তরাত্মার চিরন্তন প্রকৃতি। সংস্কৃতি আধারিত সেই জাতিসত্তাই হলো সাংস্কৃতিক জাতীয়তা। আর সামাজিক একাত্মতাই হলো এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তার বন্ধনসূত্র। তবে সামাজিক সমস্যা আমাদের কাছে যেখানে ব্যবহারিক সেখানে সাংস্কৃতিক জাতীয়তা হলো সিদ্ধান্তগত দর্শন। গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে এরা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে একাত্ম।

তাই উঁচু নীচু ভেদভাব, মর্যাদার বৈষম্য কিংবা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা নিয়ে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু এখন সেকুলার ব্রিগেডের তরফে চলছে খোলাখুলি জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সৃষ্টি হয়েছে একটা বৌদ্ধিক সংঘাতের ক্ষেত্র। সামাজিক সমরসতা, সাংস্কৃতিক জাতীয়তা এবং একাত্ম মানবতাকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চলছে জোর কদমে। কেননা এগুলোকে ধ্বংস করতে না পারলে রাজনীতির কায়েমি স্বার্থের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। সে কারণেই এদেশে আজ সংকীর্ণ জাতপাত, আঞ্চলিকতা, অনগ্রসরতা, এমনকী বিচ্ছিন্নতার মনোভাব এমনভাবে মাথাচাড়া দিতে পেরেছে। গভীর সামাজিক একাত্মতার চেতনা বা সমরসতা না থাকলে ঐকান্তিক জাতীয় চেতনা গড়ে উঠতে পারে না। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো সাংস্কৃতিক জাতীয়তা। এদেশের মানুষের এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত না হওয়ার জন্য সমস্যা থেকে গেছে। এই বিশ্বে অনেক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের উদাহরণ আছে। এর ফলে জাপান, ইজরায়েলের মতো দেশগুলো প্রভূত উন্নতি করেছে। তাহলে আমাদের দেশই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

তাই সামাজিক সমরসতা ছাড়া সাংস্কৃতিক একাত্মতা বা জাতীয়তা যেমন বিকশিত হতে পারে না, তেমনি সাংস্কৃতিক জাতীয়তার মূলেও রয়েছে সামাজিক সমসরতা অর্থাৎ একাত্মতা। যে কোনো মূল্যে নির্মাণ করতে হবে সামাজিক সমসরতা। তাহলেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তা তথা একাত্ম মানবতা আবার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু ভারতীয় জাতি হিসেবে এক সময় যে পরিচয় ছিল, এখন আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি। ভারতের জাতি এবং জাতীয়তাকে দেখা দরকার বহুকালের প্রাচীন সভ্যতার কষ্টিপাথরে। কিন্তু জাতি হিসেবে ভারতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আজকের রাজনৈতিক ভাব-ভাবনার সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি জড়িয়ে যাওয়ার ফলে জাতীয়তাবোধ মেলে না। নতুন দিনের জাতিগত ভাবনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় সংস্কৃতির ব্যবধান রয়ে গেছে। আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রধানত নির্ভর করছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। ভারতবর্ষের তথাকথিত সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এখনও লোপ পায়নি। সেই ঐতিহ্যকে পুনরায় শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের প্রয়োজন আছে। তাই বিতৃষ্ণাময় রাজনীতিকে আমল না দিয়ে আমাদের ভাবনাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া প্রয়োজন যার মধ্যে ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তা ব্যাপারটা থাকবে। ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক হলো ভারতীয় সংস্কৃতি। তাই সনাতন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক একাত্মতার ভাবনা প্রয়োজন। অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ থেকে ভারতবর্ষকে, ভারতীয় জনগণকে কখনোই দূরে সরানো যাবে না।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী

আমরা দেখে নয়, ঠেকেও শিখি না

স্বস্তিকা ১৩ জুন, ২০১৬ সংখ্যায় 'দেশদ্রোহিতাই এখন প্রগতিশীলতার সেরা

মাপকাঠি!' শিরোনামের সংবাদ প্রতিবেদনটি বরুণ দাস মহাশয় খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটু বলতে চাই। আমরা হিন্দুরা হিন্দুধর্মের মহানুভবতা ও উদারতাকে এত বেশি চর্চা করে চলেছি যে আমরা 'দেখে নয়, ঠেকেও শিখি না'। তার উপরে আবার মাথায় জাঁকিয়ে চেপে বসেছে গান্ধীর একতরফা অহিংসা তত্ত্ব। আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে, ত্যাগ করে হাজার বছর পার করে দিয়েছি, দেশভাগের নামে জমি দান করে দিয়েছি পাকিস্তান, বাংলাদেশকে। তার পরেও শিক্ষা হয়নি। সেই মুসলিম লিগ নামক বিষবৃক্ষের গোড়ায় জল, সার দিয়ে চলেছি যাতে আবার জমি দান করার ক্ষেত্র তৈরি হয়। সনাতন হিন্দুধর্মে মহানুভবতার শিক্ষার প্রভাবের ফলে— মহম্মদ ঘোরি ভারত আক্রমণ করে পরাজিত হলে পৃথ্বীরাজ চৌহান তাকে বন্দী করেন, কিন্তু ক্ষমা করে তাকে মুক্তি দেন। অথচ সেই সনাতন হিন্দুধর্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়েছেন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন; ভগবান শ্রীনারায়ণ তাই শয়তান বিনাশের জন্যই সুদর্শন চক্র ব্যবহার করতেন। সেই শিক্ষা আমরা নিতে চাইনি। রাজা চৌহান তস্কর ঘোরিকে মুক্তি দিয়ে সুদূরপ্রসারী সর্বনাশ করেছিলেন। মহম্মদ ঘোরি আবার ভারত আক্রমণ করে রাজা পৃথ্বীরাজকে বন্দী করে তাঁকে হত্যা করে। ফল হলো হাজার বছরের মুসলমানের বর্বরোচিত অত্যাচার, হত্যা, মুসলমানিকরণ। ক্ষমা, সহানুভূতির ভুল প্রয়োগ বা নির্বিচারে অপচয় হলে যা পরিণাম হওয়ার কথা তাই হয়ে চলেছে।

দেশের সীমানা রক্ষার জন্যই ভারত সরকার (সবরকম খরচ সমেত ২০১৬-১৭) ৩.৪১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য দেশ ও নাগরিক রক্ষায় অতিরিক্ত ব্যয়ভার যুক্ত হয়েছে। ভারতের আশ্রয়ে থেকে ভারতেরই খেয়ে-পরে প্রকাশ্যে সভায় ঘোষণা করে ভারতকে টুকরো টুকরো করতে চায়। এতবড় সাহস তাদের হয় কী করে? তাহলে দেশরক্ষার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে সামরিক বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন রাখার কী প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়? পৃথিবীর কোনো দেশেই এমন দুঃসাহস হয় না। তাহলে সেই সব দেশ থেকে আমাদের শেখা উচিত এমন দেশদ্রোহিতায় তারা কী করে? যতদূর জানি— দেশদ্রোহীর কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হয়।

দেশ-শত্রুর দোষ দেওয়া যায় না। প্রশ্রয় দিলে ওরা সুযোগ নেবেই। ফসলের জমিতে ফসলের পাশাপাশি আগাছা জন্মালে তা ঠিক সময়ে দমন না করলে, আগাছা ফসলকেই নষ্ট করে পুরো জমির দখল নেয়। প্রবাদেই বলা আছে 'আগাছার বৃদ্ধি বেশি'; একটু দাঁড়াবার জায়গা পেলেই আগাছা মাত করে দিতে পারে। দেশেও আগাছা জন্মেছে, প্রশ্রয় পেয়েছে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের থেকে, আর সঙ্গে আছে কংগ্রেস, তৃণমূল দলগুলি। ভারতের বিরোধী দলের নেতা, তিনি নাকি অদূর ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী, তিনি কানহাইয়া কুমারের মতন দেশদ্রোহীর (ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষায় প্রমাণিত) জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর দৌড়েছিল সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি ও সহযোগিতা করার জন্য। মানে ভবিষ্যতে ওটাকে নেতা করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই হয়তো বা। এহেন লোক যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, দেশের পরিণতি কী হতে পারে তা আন্দাজ করা যায়।

আরো একটি ভয়ের ব্যাপার হলো ওই সমস্ত দেশদ্রোহীরা আজ কলেজ, ইউনিভারসিটির ছাত্র, কাল তারা পাশ করে দেশসেবার দাবিদার হবে। ওদের যদি দেশসেবার চাকরিতে বা রাজধর্ম পালনের জন্য রাষ্ট্রসেবায় নিয়োগ করা হয় তার ফল কি হতে পারে তা অত্যন্ত দুর্ভাবনার বিষয় নিশ্চয়।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা করলেও বাক স্বাধীনতায় আঘাত বলে যে সব লোক (তারা নাকি উচ্চ শিক্ষিত) রাস্তায় নামে, তারা কিছু অ-আ-ক-খ পড়তে পারে, তবে তারা মোটেই শিক্ষিত নয়। শিক্ষা মানুষকে অবোধ করে না। নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। পাবে যদি ওরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশে বসবাস করতে শুরু করে। এই প্রকারের অনেক বুদ্ধিজীবী পূর্ব পাকিস্তান থেকে মান-ইজ্জত খুইয়ে বা কোনো রকমে বাঁচিয়ে ভারতের মতো একটি সরল দেশে পালিয়ে এসে এখানে বড়ই ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাক-স্বাধীনতার এজেন্সি (কেউ দেয়নি কিন্তু) নিয়ে বসেছে। সম্ভবত এদের নিজের ঘর না পুড়লে এদের চেতনা জাগ্রত হবে না। সেই অপেক্ষায় থেকে তো দেশকে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না!

ভারতে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা নিজ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত। নেতাজীই একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি বুঝেছিলেন হাজার বছরের নিষ্পেষিত জাতি হঠাৎ স্বাধীন হলে সে জাতি কোন্ অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। তাই জাতির অসুখ আর ওষুধের কথা ভেবে তিনি স্বাধীনতার পর ভারতে Benevolent Dictatorship অর্থাৎ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর ভারতভূমিতে ফিরে আসতে দেয়নি বৃটিশের দালালরা। তারা আজও আছে বলেই দেশদ্রোহিতা আজ 'প্রগতিশীলতার সেরা মাপকাঠি'তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু উপায় আছে; স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, এবং বিচার ও শাস্তির ব্যালান্স বা ভারসাম্য রক্ষা করা সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কঠিন আইন প্রণয়ন করে দেশের নিরাপত্তা মজবুত করা। শুধু রাষ্ট্রদ্রোহীর শাস্তি নয়, বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কেউ তার পাশে দাঁড়লে তাকেও সমান শাস্তি কার্যকর করার ব্যবস্থা হোক। অন্যথায় ভারত তার সীমানার বাইরে বিরাট শক্তিশালী দেশ রূপে বিশ্বে সমীহ লাভ করবে ঠিকই কিন্তু অভ্যন্তরে ক্রমশ হয়ে পড়বে দুর্বল।

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
বর্ধমান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

অনামিকা চক্রবর্তী

আগামী সেপ্টেম্বরেই রাজ্য এবং দেশজুড়ে সরকারি স্তরে বেশ ঘটা করে উদ্‌যাপিত হবে 'কন্যা সন্তান দিবস'। বর্তমান ভারতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ কন্যাভ্রূণ হত্যা বা শিশু কন্যা হত্যা হলেও আমাদের বাংলায় কিন্তু কন্যাসন্তানের উপর নেমে আসা এই অভিশাপ উত্তর ভারতের মতো কোনো কালেই প্রকট ছিল না। দু' একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাংলার বুকে ঘটলেও তাকে সামগ্রিক পরিস্থিতির মানদণ্ডে মাপলে ভুলই হবে। বাংলায় আগে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো কুপ্রথাগুলি ছিল, কিন্তু সেই প্রথা বাংলার জনজীবনে স্থায়িত্ব পায়নি। মেয়েকে এখানে মা-এর দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই অচেনা বা স্বল্প পরিচিত কোনো মেয়ে বা নারীকে 'মা' সম্বোধনের রীতি আছে। এমনকী বাড়ির কন্যা সন্তান বা পুত্রবধূকেও 'মা', 'বৌমা' বলে ডাকা হয়। এই বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কোথাও কিন্তু পুত্রবধূকে 'বৌমা' ডাকের স্নেহ সম্বোধন করা হয় না। ভিন্ রাজ্যে তারা কেবলই 'বহু'।

কন্যাসন্তান দিবস ও সরলা দেবী চৌধুরানি

কালের ক্রমসংস্কারে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে বাংলার নারীজীবনে লেগেছে শত পরিবর্তনের ছোঁয়া। কী গ্রাম, কী শহর, কী ধনী, কী গরিব, কী প্রান্তিক— সমাজের সকল স্তরের নারী আজ একহাত ঘোমটা টেনে, অসূর্যম্পশ্যা হয়ে দিন কাটায় না। যদি সমাজের নিম্নস্তর বা গ্রাম্যজীবনের দিকে দৃকপাত করা যায়, তবে সেখানেও দেখা যাবে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার অক্ষরজ্ঞানটুকু থেকে শুরু করে, সংসারে আর্থিক অবদানের পাশাপাশি নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের জায়গাটুকুকেও সে পাকা করেছে, এমনকী পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত সদস্যা হিসেবেও নিজেকে মেলে ধরছে। ব্যক্তিগত ধারণায় মনে হয় 'কন্যা সন্তান দিবস' তাই বাংলার ক্ষেত্রে কন্যার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সচেতনতা প্রসারের দিবস উদযাপন নয়, বরং এ হলো বাংলার কন্যা সন্তানদের জীবনে আসা সদর্থক পরিবর্তন ও তার ভবিষ্যতে আরও উন্নতির জন্য এক উৎসাহব্যঞ্জক, অনুপ্রেরণাদায়ক উৎসবমুখর দিন।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর দেশজুড়েই সাড়ম্বরে পালিত হবে এই দিবস। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাবে কন্যা সন্তানদের জন্য কি কেবলই একটা দিন, বাকি ৩৬৪ দিন তবে কি হবে? সুতরাং আমাদের মানসিকতার ওপরই নির্ভর করবে দিনটি পালনের তাৎপর্য। কন্যাভ্রূণ হত্যার কলঙ্ক কি দূরপনেয় নয়?

সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করা সরলা দেবী চৌধুরানি নারী জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাতে কন্যা সন্তান দিবস পালনের উৎসাহ আরও মর্যাদাময় হয়ে উঠবে।

ঊনবিংশ শতকের যে সময়ে তিনি জন্মেছিলেন। তারও আগে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলায় নারী জাগরণ শুরু হলেও, সেই জাগরণ তখনও পর্যন্ত জনজাগরণে পরিণত হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ১৮৮৬ সালে মাত্র তেরো বছর বয়সে এন্ট্রান্স ও সতেরো বছর বয়সে অনার্স-সহ বিএ পাশ করেন।

মেয়ে হয়েও তিনি বুঝেছিলেন পরাধীন, নিদ্রিত জাতিকে জাগাতে হলে তার মধ্যে বীররস সঞ্চার করতে হবে। তাই একসঙ্গে তিনি পালন করেছিলেন 'প্রতাপাদিত্য উৎসব', 'উদয়াদিত্য উৎসব', বীরাষ্টমী ব্রত। যুবসমাজের শিরায় শিরায় ইংরেজ বিরোধী, স্বদেশ প্রেমের অগ্নিস্রোত বইয়ে দিতে 'ভারতী'তে লিখেছেন, 'বিলিতী ঘুষি বনাম দেশি কিল। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠনেও বিপ্লবীদের সহায়তা করেছিলেন। একসময় তাঁর কাছে ঠাঁই পেয়েছিলেন বরোদা থেকে আসা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)। 'বঙ্গের বীর' সিরিজের ছোট ছোট পুস্তকও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশি দ্রব্য প্রসারে খুলেছিলেন 'লক্ষ্মীভাণ্ডার', 'স্বদেশি স্টোর্স'। তাঁর এই সকল কর্মকাণ্ডে বোঝা যায়, স্বদেশি চেতনায় কোনো পুরুষের তুলনায় কম ছিলেন না তিনি। কেবল যুবজাগরণেই ক্ষান্ত থাকেননি। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থাপন করেছিলেন 'ভারত স্ত্রী- মহামণ্ডল' যার শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

যথার্থই তিনি ছিলেন বাংলার সেই যুগের মশালবাহক, নারী সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর প্রেরণায় সেইসময় বহু নারী হাতে তুলে নেয় বই, হাজার হাজার গৃহবধূ ঘরের আগল ভেঙে পা রাখেন বহির্জগতে। কেবলমাত্র দেশমাতাকে বিদেশি শাসন শৃঙ্খলমুক্ত করার আশায় এই এক নারী সমাজে এনেছিলেন শিক্ষার চেতনা, স্বদেশ প্রেমের চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক চেতনা। তাই 'কন্যা সন্তান দিবস' ও সরলা দেবীর জন্মমাসের মিলিত শুভক্ষণে বাংলায় বর্ষিত হোক ঈশ্বরের আশিস। যাতে বাংলার মেয়েরা ভবিষ্যতের পথে সার্থকভাবে বহন নিয়ে যেতে পারে সরলাদেবীর মতো বঙ্গকন্যাদের সার্থক উত্তরাধিকার।

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of -

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455

E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511

Fax : (91-6542) 253701

লিভার ভালো রাখুন

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

মানুষের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার বা যকৃত। কার্যকারী এই অঙ্গটি অবহেলিত হলে আমাদের নানারকম সমস্যায় ভুগতে হয়। আমাদের জেনে রাখা জরুরি লিভার ভালো রাখতে কী কী উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

লিভারের কাজ কী :

লিভার শরীরে নানাধরণের কাজ করে থাকে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হলো— শরীরের বিপাক ও পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। লিভার তৈরি পিত্তরস খাদ্যনালী থেকে ফ্যাট শোষণে সাহায্য করে।

কখনও খাবারের সঙ্গে (খাবারের রং, প্রিজারভেটিভ), কখনও জলের সঙ্গে (আর্সেনিক), আবার কখনও ওষুধের সঙ্গে (কোনো সিডেটিভ, অ্যানালজেসিক) ক্ষতিকর পদার্থগুলি নানাভাবে শরীরে ঢোকে। এসব ক্ষতিকর পদার্থকে সরিয়ে শরীরকে বিষমুক্ত করা লিভারের কাজ।

লিভার শরীরে ছাঁকনির কাজ করে। কয়েক ধরনের পরজীবী (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া) শরীরে ঢোকার পর তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি করার আগেই লিভার সেগুলিকে শরীর থেকে বের করে দেয়। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে।

আমাদের শরীরে লোহিত কণিকা ১০০-১২০ দিন বাঁচে। তারপর নষ্ট হয়। ক্রমাগত নতুন লোহিত কণিকা তৈরি হয় ও পুরনো কণিকাগুলি ভেঙে যায়। আর ভেঙে যাওয়া এসব কণিকার ভেতরের হিমোগ্লোবিনের বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় লিভার।

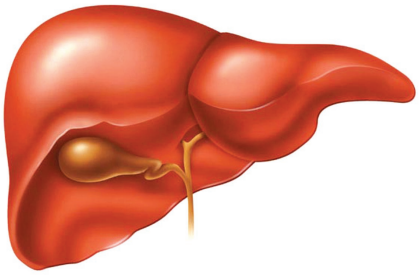

যে সব কারণে লিভার খারাপ হয় :

দূষিত খাবার ও জলের মাধ্যমে, কয়েক ধরনের ওষুধের নিয়মিত ব্যবহারে, ইনফেকটিভ বা ভাইরাল হেপাটাইটিস হলে, ক্রমাগত আমাশয় ও ম্যালেরিয়ায় ভুগলে এবং অতিরিক্ত মদ্যপান করলে।

লিভার খারাপের উপসর্গ :

খিদে থাকে না, অল্প খেলে পেট ভরে যায়।

জন্ডিস হওয়া।

অজীর্ণ ও হজমের সমস্যা প্রভৃতি।

লিভার ভাল রাখতে করণীয় :

বিশুদ্ধ জল পান করতে হবে।

দুষিত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রঙিন খাবার, ফাস্ট ফুড, কোল্ড ড্রিংঙ্ক প্রভৃতি এড়িয়ে চলুন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুষম খাবার খেতে হবে যাতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল প্রভৃতি সব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে থাকবে।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মেনে ওষুধ খেতে হবে। নিজের ইচ্ছেমত ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী মাইরকা, লাইকোপোডিয়াম, চেলোডোনিয়াম, ম্যাগ ফস, নেট্রাম মিউর প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ ও ওষুধের মাত্রা নির্বাচন করেন, যা চিকিৎসাক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

PBOM

Office : 2269-3527, 2268-7127
Resi. : S. B. Bagaria-2283-2352
Cell : S. B. Bagaria - 98301 13354
Cell : Yogesh Poddar - 98303 04198
Cell : Manish Poddar - 98300 52686

BHARATI TEL UDYOG PVT. LTD.

(Mfrs. : MOHWA, COCONUT, SUNFLOWER, RICE BRAN SOL. OILS & D-OILED CAKES)

Regd. Office :

187, Rabindra Sarani, 2nd Floor, R. No. 74
Kolkata-700 007

Works :

Sainthia, Dist. : Birbhum (W.B.), Phone : (03462) 262239, 9434030090

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203, 22488036, 37
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

ধর্মনিরপেক্ষতা সাংস্কৃতিক জাতীয়তার অঙ্গ

আশিস রায়

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের বর্তমান সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মূল সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক রাষ্ট্রকে বোঝায় না। ড. রাধাকৃষ্ণনের মতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে ধর্মের ক্ষেত্রে উদাসীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো ভারত ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এখানে কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচরণ করে। ড. বি আর আম্বেদকর আলাদা করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটির উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কারণ সংবিধানের প্রস্তাবনাতে চিন্তা, বাক্, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনাতে মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে। ভারতের সংবিধান রচয়িতারা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে একটি উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ কী সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বোঝায় না। রাষ্ট্র ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। ভারতে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো গোঁড়ামি নেই। ধর্মবিশ্বাস মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ড. আম্বেদকরের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ হলো রাষ্ট্র মানুষের উপর কোনো ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে গণপরিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকর বলেছেন— 'সব নাগরিকের সমান অধিকার আছে। রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখায় না। রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমান স্বাধীনতা দেয়।' তাঁর মতে ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু রাজনৈতিক মতবাদ নয়। এটা নেতিবাচক তত্ত্ব নয়, এটা ইতিবাচক তত্ত্ব। জে সি জোহারির মতে, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতিগতভাবে খুবই উদার। ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন সকলের সমান অধিকার আছে, আবার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির জন্য কিছু বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। যেমন শিখদের 'কৃপাণ ধারণ' এবং খৃষ্টানদের ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ হিন্দু। কিন্তু হিন্দুধর্মের কথা বললেই তা সাম্প্রদায়িক, আর সংখ্যালঘু ধর্মের কথা উল্লেখ করলেই তা অ-সাম্প্রদায়িক। হিন্দুরা 'Communal', আর অন্যরা 'Secular'? এর উত্তর সংবিধানে নেই। সেই কারণে মূল সংবিধান রচয়িতারা 'সেকুলার' শব্দটি প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেননি। হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা মন্দিরের উপর মাইক লাগিয়ে উপাসনা করে না। কিন্তু মুসলমানরা মসজিদের উপর মাইক লাগিয়ে উচ্চস্বরে নামাজ পড়ে এবং শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে। তাঁদের ক্ষেত্রে প্রশাসন চুপ বা নীরব দর্শক। আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে যত অবিচার। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ হিন্দু। বিদেশে ভারতকে বলা হয় 'হিন্দুস্থান'। 'হিন্দু' কোনো বিশেষ ধর্ম নয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'Hindutva is a way of life, it is a way of thinking'। গীতা, উপনিষদ, চণ্ডীতে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। আমরা 'হিন্দুস্থানের বা ভারতের নাগরিক হিসাবে গর্বিত। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, সর্ব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। আমরা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি না। তাই ভারতের সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সকলের সমানভাবে ধর্মপ্রচার, স্বীকার ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা আছে। কোনো বিশেষ আচার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা তা আদালত নির্ধারণ করবে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও সংরক্ষণ করতে পারবে। কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা একেবারে নিষিদ্ধ। ভারতের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অবাধ নয়। জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতার স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিশ্বের অন্য কোনো দেশের সংবিধানে এত উদার ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ নেই, যা ভারতে আছে।

পরিশেষে, ভারতে সব ধর্মের মানুষ বসবাস করে। পুণ্যভূমি ভারতে সব ধর্মই সমান। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকার করা হয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্য হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা বলা যায়। সংখ্যালঘুদের মনে বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকার করা হয়েছে। অনেকে অভিযোগ করেন যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতির জন্য দায়ী হলো ধর্মের ক্ষেত্রে অতি উদারতা। বিভিন্ন সম্প্রদায় এই অধিকারকে অন্যায়ভাবে অপব্যবহার করছে। ধর্মের জিগির তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির আন্দোলন প্রায় ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বর্তমানে তোষামোদের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি গুরুত্ব বা তোষামোদ নয়, সব ধর্ম বা উপাসনা পদ্ধতির প্রতি সমান ন্যায়বিচার অবলম্বন যা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ এই ভাবনাকে আরও দৃঢ় করার জন্য শুধু সাংবিধানিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, দেশবাসীর মধ্যে প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজন, শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন।

(লেখক একজন অধ্যাপক)

পাকিস্তানে জুতোয় 'ওঁ' : হিন্দুদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দু মহামন্ত্র 'ওঁ' লেখা জুতো বিক্রির অভিযোগ উঠল পাকিস্তানে। সিন্ধু প্রদেশের ট্যান্ডো অ্যাডম খান নামক শপিংমলের কয়েকটি দোকানে ওঁ লেখা জুতো বিক্রি হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই সে দেশের হিন্দুরা ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের হিন্দু পরিষদের প্রধান রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই সিন্ধু প্রদেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট শপিংমল কর্তৃপক্ষের কাছে

অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইদুজ্জোহা উপলক্ষে কয়েকটি দোকানে এরকম জুতো বিক্রি হচ্ছিল। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কারণ হিন্দুদের অপমান আর হিন্দুমন্ত্রকে অশুচি করা ছাড়া এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইদানীং ফেসবুকে হিন্দু দেবদেবীদের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য সংবলিত পোস্টের সংখ্যা বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এইসব ফেসবুক অ্যাকাউন্টের বেশিরভাগই পাকিস্তান থেকে পরিচালিত হয়। ভারতে বসবাসকারী মুসলমান যুবকদের মগজধোলাই করার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

চার্চের আপত্তি উপেক্ষা করে মিজোরামে যোগদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খৃষ্টান অধ্যুষিত মিজোরামে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালিত হলো। চার্চ এবং অন্যান্য খৃষ্টান সংগঠনগুলির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সাধারণ মানুষ এই প্রথমবার দিনটির যথার্থ উদযাপনে সামিল

হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছর থেকে ২১ জুন দিনটি আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে সারাবিশ্বে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের পরিচালনায় অসম রাইফেলসের মাঠে বসেছিল যোগদিবসের আসর। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সহস্রাধিক মানুষ যোগদিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নানা বয়েসের মানুষের আসন প্রণায়ামের ছবিতে ভরে যায় অসম রাইফেলসের মাঠ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং মিজোরামের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল নির্ভয় শর্মা যোগকে শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের সহায়ক বলে বর্ণনা করেন। তিনি খৃষ্টান চার্চগুলি 'যোগ হিন্দুধর্মের অঙ্গ' বলে যে অপপ্রচার করে থাকে তা নস্যাৎ করে দেন। অল্প বয়েস থেকে যোগাভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলে তিনি জানান, 'আমি নিজে নিয়মিত আসন-প্রাণায়াম করি। তার যে কী উপকার আমি জানি। তাই এত মানুষকে আন্তর্জাতিক যোগদিবসে অংশ নিতে দেখে খুবই ভালো লাগছে।' তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ নিয়মিত যোগচর্চা করলে তা সরকারের 'হেলদি মিজোরাম' কর্মসূচিরও সহায়ক হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে মিজোরামের চার্চগুলি মানুষের এই উদ্দীপনায় যারপরনাই রুষ্ট। খবরে প্রকাশ, রাজ্যের ১৩ট বড়ো চার্চের সংগঠন মিজোরাম কোহ্‌রান হ্রুয়াইটিউট কমিটি (এম কে এইচ সি) অনেক আগেই সদস্যদের যোগদিবস পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তাদের বক্তব্য, ভারতীয় যোগ এমন একটা জিনিস যা খৃষ্টধর্মের শিক্ষা (পড়ুন প্রভাব)-কে লঘু করে দিতে পারে।

একজন এম কে এইচ সি এক সদস্য বলছেন, 'আমরা প্রত্যেকটি শাখা-চার্চকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যোগদিবস পালনের ব্যাপারে সদস্যদের সাবধান করে দেওয়ার জন্য।' শুধু এম কে এইচ সি নয়, আরও অনেক চার্চ তাদের সদস্যদের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি। মিজোরামের মানুষ উৎসাহের সঙ্গে যোগদিবস পালন করেছেন।

এন এস জি ব্যর্থতায় ভারতের হতাশ হবার কিছু নেই

সন্দীপ চক্রবর্তী।। অনেকেই ভেবেছিলেন শেষপর্যন্ত ভারত বাধা অতিক্রম করে এন এস জি-র সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাহসী ও উজ্জীবিত নেতৃত্বই এই বিপুল প্রত্যাশার জন্য দায়ী। দুর্ভাগ্যবশত চীন ও তার অনুগামী কয়েকটি দেশের অনৈতিক বাধা ভারত অনেক চেষ্টা করেও অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু তার জন্য হতাশ হবার কিছু নেই। এবছরের শেষেই ভারত আর একটি সুযোগ পাবে। চীনকেও তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কারণ তা না হলে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

ভারত-আমেরিকার বন্ধুত্বে যথেষ্ট চাপে রয়েছে চীন।

কিন্তু সমস্যা হল, দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ভারতের এই তথাকথিত 'পিছু হটাকে' কেন্দ্র করে সরকারের বিরূপ সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, এন এস জি নিয়ে বিরাট প্রত্যাশা জাগিয়ে শেষমুহূর্তে কিছু করতে না পারায় দেশের মুখ পুড়েছে। তাদের অভিযোগ, ২০০৮ সালে আমরিকার সঙ্গে যে চুক্তি হয় তাতে ভারতকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। যার ফলে বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা ছিল না। এসব রাষ্ট্রই এন এস জি-র অন্তর্ভুক্ত। অথচ প্রধানমন্ত্রী কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে অবাস্তব গোঁ ধরে সারা দেশের মুখ পোড়ালেন।

কংগ্রেসের অভিযোগের সারবত্তা বিচার করার আগে কয়েকটি জিনিস একটু স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। তা না হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন এন এস জি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি চান সেটা বোঝা যাবে না।

এন এস জি কী?

এন এস জি-র পুরো অর্থ নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ। এটি বিশ্বের ৪৮টি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের একটি জোট। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে পারে। বস্তুত বিশ্বজুড়ে চলা পারমাণবিক অস্ত্র-বাণিজ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রক তারাই। বিশ্বের পারমাণবিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে চলা এন এস জি-তে অন্তর্ভুক্তির প্রধান শর্ত।

ভারত কেন এন এস জি-তে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়?

গত বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'পরিবেশ সম্মেলন'-এ আমন্ত্রিত প্রতিটি দেশ গ্রীন হাউস গ্যাসের (কার্বন-ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) ভয়াবহতা সম্পর্কে সহমত পোষণ করেছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রতিটি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা)-র ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার প্রয়াস করবে। সারা বিশ্বের মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের সিংহভাগ কয়লা পোড়ানোর ফলে তৈরি হয়। আরও একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের প্রধান গ্রীন হাউস গ্যাস উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারত রয়েছে প্রথম দিকে। এখানেই উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভারতের বিদ্যুৎক্ষেত্রে প্রধান উৎপাদক তাপবিদ্যুৎ সংস্থাগুলি। সর্বাধিক কয়লা সেখানেই ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্মেলনে জানিয়েছিলেন ভারতে বিকল্প বিদ্যুতের (সৌর, জল ও বায়ু) পরিষেবা কোনো কোনো জায়গায় শুরু হয়েছে ঠিকই, কাজও হচ্ছে যথেষ্ট সন্তোষজনক গতিতে, কিন্তু তার ভরসায় রাতারাতি তাপবিদ্যুতের ব্যবহার কম করা এককথায় অসম্ভব। ভারত যদি পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে একমাত্র তাহলেই কয়লার ব্যবহার কম করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন এন এস জি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি। তা না হলে গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি পরমাণু শক্তি-বাণিজ্যে যে বিশেষ সুবিধা পায় ভারত তা পাবে না। অনেক বেশি দাম ভারতকে দিতে হবে।

সুতরাং এন এস জি-তে ভারতের

With deepest Gratitude

Mr. Nikhil Bhandari

36, Basement 8, Camac Street, Kolkata–700017

SKJ CONSULTANT & FINANCIERS PVT. LTD.

(FRANCHISEE OF ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED)

TIN FACILITATION CENTRE & PAN CENTRE
CERTIFIED FILING CENTRE
FOR MCA-21
E-FILING OF INCOME TAX RETURN

5, Commercial Building, Ground Floor, 23A Netaji Subhas Road , Kolkata-700 001,
Phone : 2242-8964, 4005-0066 E-mail : sunil_skj@rediffmail.com,
sunil_skj@hotmail.com, sunilskj10@gmail.com

H.O. : 6, CommercialBuilding, 1st floor, 23A Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

PRAKASH PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member : The National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED

(Investment & Mutual Funds Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

312/313, Todi Chambers, 2, Lal Bazar Street, Kolkata-700 001

Phone Nos. 2230 0405, 2230 5846, Fax : (033) 2248 1576, E-mail : prakash_laurel@yahoo.com

অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রাথমিকভাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জন্য। পরিবেশ রক্ষার জন্যও বলা যায়। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র বাণিজ্যের প্রশ্নটি। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে অন্যতম পারঙ্গম দেশ হিসেবে ভারত বাণিজ্যের দাবি করতেই পারে। কংগ্রেস বলছে, ২০০৮ সালে এব্যাপারে ভারতকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ভারত তাতেই সন্তুষ্ট থাক। হাস্যকর যুক্তি! ছাড়কে অধিকারে পরিণত করতে আপত্তি কোথায়? বিশেষ করে যেখানে ঘাড়ের কাছে পাকিস্তান ও চীনের মতো দেশ রয়েছে। প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও জঙ্গি হামলা হচ্ছে। দেশের একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় নিরন্তর চাপে রাখছে হিন্দুদের।

এছাড়া আরও একটি প্রশ্ন আছে। যে প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেসই ভালো দিতে পারবে। ২০০৮ সালে পাওয়া বিশেষ ছাড় কি ভারত আজ অবধি কাজে লাগাতে পেরেছে? না পারলে কেন পারেনি? এ প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খুঁজেছেন। সেইজন্যই এন এস জি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছেন।

ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে চীনের আপত্তির কারণ :

মূলত চীনের আপত্তিতেই ভারতের আশাভঙ্গ হয়েছে। চীন শর্ত দিয়েছিল, ভারতকে আগে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। তারপর তারা ভারতকে সমর্থন করবে। বলা বাহুল্য, ভারত এই প্রস্তাব মানেনি। কারণ, বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর না করেই এন এস জি-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফ্রান্স তাদের অন্যতম। ৪৮ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকাংশ ভারতের বক্তব্যকে সমর্থন করলেও চীন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। চীনকে সমর্থন করে তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ।

দীর্ঘদিন ধরে চীন দক্ষিণ এশিয় ভূখণ্ডসহ ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত। এব্যাপারে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে আমেরিকা ও জাপানের সখ্যে যথেষ্টই চাপে রয়েছে চীন। তাই তারা পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। বেশ কয়েক বছর ধরে পাকিস্তান যে ট্যাকটিক্যাল অ্যাটমিক ওয়েপনস্ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে তা মূলত চীনেরই বদান্যতায়। পাকিস্তানের যুক্তি, ভারত তাদের চিরাচরিত রণকৌশল পাল্টে তড়িৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রস্তুত পাকিস্তানের দখল নেওয়ার জন্য বিশেষ বাহিনী তৈরি করেছে। পাকিস্তান ট্যাকটিক্যাল অ্যাটমিক ওয়েপন্ নেটওয়ার্কের সাহায্যে ভারতের আগ্রাসন রুখে দিতে চায়। ভারতও অবশ্য বসে নেই। তাদের রয়েছে স্ট্রাটেজিক অ্যাটমিক ওয়েপন নেটওয়ার্ক, যা দিয়ে লাহোর-ইসলামাবাদ সহ গোটা পাকিস্তানকে পনের মিনিটের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বল্প মাঝারি এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে সাম্প্রতিক কালে ভারতের অভাবনীয় সাফল্য। অগ্নি-৫-এর পাল্লা ৫০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ যার আওতায় রয়েছে খোদ বেজিং। সুতরাং চীনের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আরও একটা ঘটনা চীনকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। সেটি হল মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম (এম সি টি আর) নামক আন্তর্জাতিক জোটে ভারতের অন্তর্ভুক্তি। আর এই অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করেই। আমেরিকা-রাশিয়াসহ বিশ্বের তাবৎ পরমাণু শক্তিধর দেশ বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা ভারতের পাশে, চীনের নয়।

এই সমস্ত কারণেই চীনের আপত্তি। নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি-টুক্তি কথার কথা। বিশ্ব রাজনীতির এসব কূটকচালি কংগ্রেস জানে না তা নয়, কিন্তু সময়মতো না জানার ভড়ং করে। কংগ্রেসের দাবি, এন এস জি-তে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ভারত কেন পাকিস্তানকে সমর্থন করল তার জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে। সঙ্গত কারণেই সমর্থন করেছে। চীনের বন্ধু তুরস্ক কৌশলগত কারণে পাকিস্তানের নাম প্রস্তাব করেছিল। ভারত খুব ভালোভাবেই জানে, বিশ্বের কোনো দেশ (বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলি এবং আমেরিকা) পাকিস্তানের আবেদন মানবে না। ভারত সমর্থন করলেও না। তার কারণ, পরমাণু প্রযুক্তি পাচার করতে গিয়ে আগেই তারা ধরা পড়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে তারা যেভাবে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বানিয়ে চলেছে তাতে সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন। এরপর যদি তাদের এন এস জি-র সদস্য করে নেওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত তারা পরমাণু অস্ত্র উগ্রপন্থীদের হাতে তুলে দেবে। তাতে ক্ষতি শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের। সুতরাং, পাকিস্তানকে ভারতের সমর্থন ছিল তুরস্কের কৌশলের পাল্টা কৌশল। যাতে সাপও মরে আবার লাঠিটাও অক্ষত থাকে।

যাই হোক, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবছরের শেষে এন এস জি-র আর একটি সম্মেলন বসবে। সেই সম্মেলনে ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গ যে আবার উঠবে সেকথা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই কয়েকটি দেশ ভারতকে আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এখন প্রশ্ন, চীন কি ভারতকে সমর্থন করবে নাকি তখনও গোঁ ধরে থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকখানি নির্ভর করছে চীনের ওপর। আর কিছুটা বিশ্ব রাজনীতির তখনকার সমীকরণের উপর। চীন কোনো অবস্থাতেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হারাতে চাইবে না। ভারত যদি তার বাজারে চীনা মাল ঢুকতে না দেয়, তাহলে চীন অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আবার চীন যদি এন এস জি-তে ভারতকে সমর্থন করে তাহলে ভারত যে একদিন চীনকেই চ্যালেঞ্জ করে বসবে না তার কী গ্যারান্টি আছে?

এই চাপান-উতোর এখন চলবে। দেশের বিরোধী রাজনীতিও উত্তাল হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, ভারতের সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি। এন এস জি-র নভেম্বরের বৈঠক পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ভালো খবরের জন্য। ■

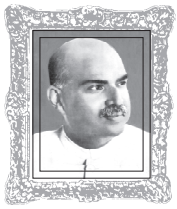

" The Country Owes an unlimited gratitude to Dr. Shyamaprasad Mukherjee for his Sacrifices for Kashmir."

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

With Best Compliments :-

A well Wisher

Shree Gopal Jhunjhunwala

Gita Seva Trust

With Best Compliments of :-

MAITHAN ALLOYS LIMITED

P.O. - Kalyaneshwari - 713369
Dist - Burdwan
(west Bengal)

Ph : 0341-6464693 / 6464694,

Fax : 03412521303 / 2522996

Manufacturers of :

FERRO ALLOYS

With deepest Gratitude

Mr. Shailendra Bhandari

36, Basement 8,

Camac Street

Kolkata–700017

শব্দরূপ-৭৯৪ শামাপ্রসাদ দাশ

১		২		■	৩	৪	
■	■		■	৫	■		■
৬	■		■	৭			৮
৯			১০		■	■	
	■	■	১১		১২		
১৩	১৪			■		■	
■		■		■		■	■
১৫			■	১৬			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. শরৎশশী, বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক, ৩. শ্বেত কমল, ৭. হীরাকস, ৯. জৈন ধর্মগুরু, তীর্থঙ্কর, ১১. মিষ্টি আলু, ১৩. মেরুদণ্ড, ১৫. রেশম ও কার্পাস মিশিয়ে প্রস্তুত দামি বস্ত্র, ১৬. 'অনাদরে আনা যায় কত—' (ঈশ্বর গুপ্ত)।

উপর-নীচ : ২. কূলকিনারা, শৃঙ্খলা, ৪. সংস্রব, ৫. কাদার মতো ঈষৎ ঘনত্বযুক্ত, ৬. নবরত্নের অন্যতম, ৮. মুসলমান ফকির, ১০. ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, ১২. রবিঠাকুরের সাহিত্যরীতির অনুসরণ, ১৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯১
সঠিক উত্তরদাতা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
কৃপাসিন্ধু মণ্ডল
খাতড়া, বাঁকুড়া

■	হা	ল	খা	তা	■	নী	লা
বা	ত	■	ম	ল	■	ল	■
বা	সা	■	■	ন	■	ক	■
■	ফা	■	অ	ব	গু	ষ্ঠ	ন
রা	ই	■	■	মী	ন	■	ন্দী
না	■	বে	■	■	■	■	■
■	গা	ধা	খা	টু	নি	■	ক
■	■	ই	■	লি	■	■	ষ্ঠী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৯৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ জুলাই ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

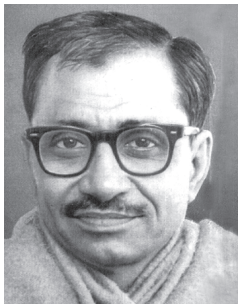

আমাদের রাষ্ট্রীয়তার ভিত্তি হলো 'ভারতমাতা'। কেবল ভারত নয়। মাতা শব্দ হটিয়ে দিলে ভারত শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড রূপে রয়ে যাবে। এই ভূমির প্রতি আমাদের মমত্ববোধ তখনই আসবে যখন তার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক যুক্ত হবে। কোনো ভূমিখণ্ডকে দেশ বলা যাবে না যতক্ষণ না তার সঙ্গে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। এটা দেশভক্তি। দেশভক্তির অর্থ শুধুমাত্র ভূমিখণ্ডের প্রতি ভালবাসা নয়। পশু-পাখিও নিজের বাসাকে ভালবাসে। সাপ গর্ত কখনো ত্যাগ করে না। সিংহ, বাঘ গুহাতেই বাস করে। পাখি তার বাসায় রোজ ফিরে আসে। এদের দেশভক্ত বলা যাবে না। মানুষ যেখানে বসবাস করে সেখানে তার সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এতেই দেশভক্তি সৃষ্টি হয় না। যারা এদেশে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাদের ভালবাসাকেই দেশভক্তি বলা যেতে পারে। পুত্ররূপ ব্যক্তি ও মাতারূপ ভূমির সম্পর্কের ফলে দেশ সৃষ্টি হয়। এই দেশভক্তি চিরস্থায়ী।

দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও দেশে কেন চৈতন্য নির্মাণ হয়নি? দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেরোজগারি, নিরাশা, হতাশা কেন বাড়ছে? রাষ্ট্রীয় চরিত্র কেন কমে যাচ্ছে? আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য সমস্ত ক্ষেত্রে কেন ক্রমাবনমন চলছে এবং রাষ্ট্র জীবনপ্রবাহ কেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে? কেন আমরা এমনভাবে ভেসে চলেছি? নিঃসন্দেহে এর একটিই উত্তর যে, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। যে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে তাকে ভেসেই যেতে হবে। যে গাছ শিকড় থেকে উপড়ে বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছে জলের তোড়ে এপার ওপারে ধাক্কা খেতেই হয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন শিকড় হারিয়ে ফেলেছে। এই পতনকে আটকানোর একটিই উপায় আছে তা হলো রাষ্ট্রজীবন প্রবাহে অবগাহন করা। শুদ্ধ রাষ্ট্রভাব ছাড়া কোনো রাষ্ট্র প্রগতি তো দূরের কথা, তার স্বাধীনতাকেও টিকিয়ে রাখতে পারে না। পরম্পরাগত রাষ্ট্রীয়তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে আমরা বিপদের মধ্যে পড়েছি। এ থেকে বাঁচার জন্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মূল সজীব করতে হবে। তাহলেই রাষ্ট্রজীবনে চৈতন্য নির্মাণ হবে। এই চৈতন্যের অভাবই আমাদের রাষ্ট্রীয় পতনের মূল কারণ।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৭

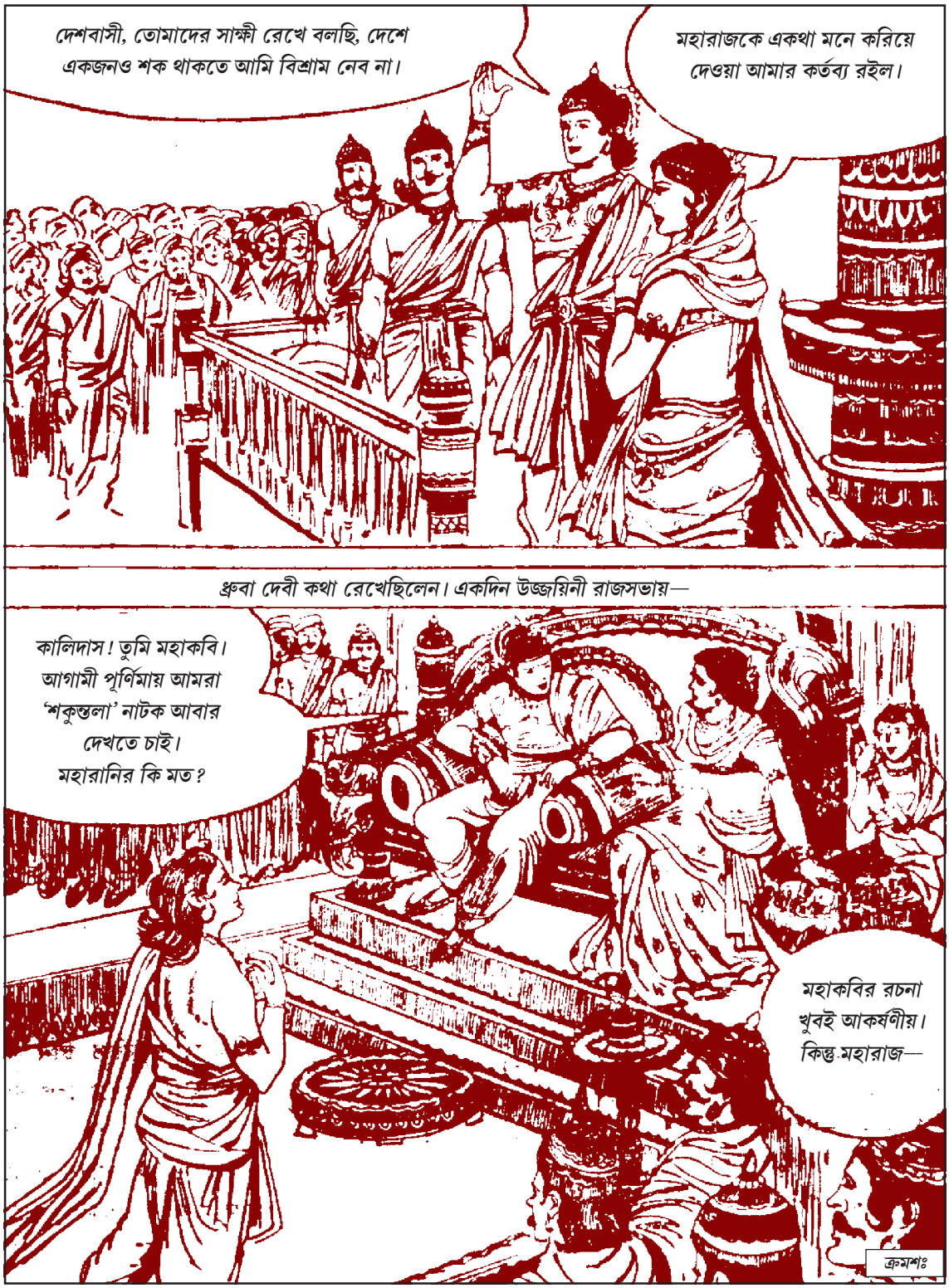

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area,
Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

Jaya Shree

THE NAME THAT IS INTERWOVEN
WITH TEXTILES THE WORLD OVER

PURE LINEN AND
LINEN BLENDED FABRICS
HIGH PERFORMANCE
FLAME RETARDANT FABRICS
WORSTED YARNS
LINEN YARNS

JAYA SHREE TEXTILES

A UNIT OF ADITYA BIRLA NUVO LTD.

Rishra, P. O. Prabasnagar–712249, Dist. Hooghly, West Bengal, India.

MK Point
AT 27, BENTINCK STREET,KOLKATA

AGRAWAL & AGRAWAL

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
4 July - 2016 - Rs. 10.00, Shyamaprasad issue

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.

দাম : ১০.০০ টাকা